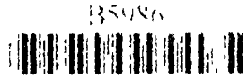
শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

পঞ্চম খণ্ড

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

গ্রন্থিত



৯ম সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৪ নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন
কলিকাতা

৯ম সংস্করণ
মূল্য ৩৲
পৌষ, ১৩৫৯

তারকনাথ প্রেস
৯ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

অমিয়নিমাই-চরিত

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু প্রায় শতাধিক নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত শ্রীগৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন। জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদিগের নিয়ম যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়াছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা দেশে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি একটু আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন সেই-খানেই লোকারণ্য। যখন পথ চলিয়াছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে। কেবল নবদ্বীপে আসিয়া বাচস্পতির গৃহে দুই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অমনি লোকারণ্যের সৃষ্টি হইল।

প্রভু জননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বৃন্দাবন

যাইবেন বলিয়া চলিলেন, তাহা নহে। প্রভু চলিয়াছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভু চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন? শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্রভু বিহ্বল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। যেমন নদী যতই সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ততই পরিসর হয়, সেইরূপ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গী-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা সুকঠিন। সহস্র হইতে পারে, দশ সহস্র হইতে পারে, লক্ষ হইতেও পারে। গৌড়ীয় বাদশা তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরে ইহাদিগের কলরব শুনিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভীত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা দ্বারা কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক ইহাদিগের আহার কে দিতেছে? অবশ্য ইহাদিগের পথের সম্বল কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে হইতেছে না। প্রভু তাঁহার বহু সহস্র পার্ষদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাহ্নভোজন করিবেন, সেই গ্রামস্থ লোক জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধান নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছেন। একজন কি দুইজনে এ ভার সমাপ্ত করিতে পারেন না। গ্রাম-সমেত লোক একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্রভু গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন।

প্রভুর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তের সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতেছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা (ভোজন) করিয়া, মুখশুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। গোবিন্দ ঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটি হরীতকী আনিয়া প্রভুকে তাহার এক খণ্ড দিলেন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে আবার হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহির্ব্বাসে যে হরীতকী খণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তখনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কল্য তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবামাত্র কিরূপে দিলে?" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাখিয়াছিলাম; অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনও সঞ্চয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়াই গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রভু বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার দ্বারা আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়-বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে সে বাসনা নাই। তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অচিরাৎ আমি নির্দ্দেশ করিয়া দিব।" গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর সেইবার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমার দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এইজন্য তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি স্ব-ইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাক। আমি সত্বর তোমাকে সন্দেশ পাঠাইয়া দিব।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা করিলেন ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটির

নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে একখানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়া-কাঠ। শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একটু পরে বোধ হইল যেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ আমি আসিতেছি। তুমি যেখানি পোড়া-কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটিরে রাখিয়া দাও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং কাঠখানা লইয়া কুটিরে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কাঠ নয়, একখানি কাল পাথর। ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লইয়া, প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া গোবিন্দের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বহুতর লোক সঙ্গে সুতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ ত" গোবিন্দ করজোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" তখন প্রভু বলিতেছেন,

"কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভুর এ কথা অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

পর দিবস একজন ভাস্কর আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের কুটিরে সেই শ্রীমূর্ত্তি নিজহস্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ" ; আর এইরূপে "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" প্রকাশ পাইলেন। ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।"

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙ্গে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, এই ঠাকুর সেবা কর ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করুণার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটি পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটি রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। সুতরাং গোবিন্দের ঘাড়ে এখন দুইটি সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও নিজের শিশু পুত্র। ইহাতে গোবিন্দ কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা সহজে অনুভব

করা যাইতে পারে। কষ্টে স্বষ্টে দুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া বাৎসল্যভাবে সেবা করেন।

তাঁহার মন এখন দুজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন এই তাঁহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রের সেবা করেন, কখন পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন। এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটি লইলেন! তখন গোবিন্দ মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবেন, তবে যেমন তেমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রকৃত মনের কথা এই যে; তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে, সচ্ছন্দে আমার পুত্রটি লইয়া গেলেন!"

গোবিন্দ মনোদুঃখে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলে তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি কে উহাকে খাইতে দেয়। আমিও উঁহাকে অপরাধ দিয়া উঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।" কিন্তু গোপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব, ও

গোপীনাথ্ ভগবান। যেমন সন্তান মাকে দুঃখ দিয়া থাকে, সেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কখন কখন ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন।

যখন নিশি হইল তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি, তোমার কি মায়া দয়া নাই? সারাদিন গেল, তবু তুমি জল-বিন্দু আমাকে দিলে না? গোপীনাথ ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিত। যখন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব? আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আমাদ্বারা তোমার আর সেবা হইবে না।" গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত যে গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতরভাবে কথা বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না। গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাকে অনাহারে কেন বধ কর বাপ?"

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, "ঠাকুর আমার পুত্রটী কাড়িয়া লইলে তোমার একটু দয়া হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতেছ, সে সমুদয় তোমার বাহ্য।" ইহাতে গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ! এরূপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল তাহা নহে, লোকের চিরকালই এরূপ হইয়া থাকে। দুঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

ইহাতে গোবিন্দ কিছু ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শেষে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সব বুঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটীকে হঠাৎ আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলে তোমার একটু দয়া হইল না? তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলি। যাহার দুই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যখন তোমার আর একটী পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার দুই পুত্রই হারাইতে—আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ! দুঃখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।" গোবিন্দ একেবারে নিরুত্তর, আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না। তখন হঠাৎ একটি কথা মনে আসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, সকল প্রকারে ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "তথাস্তু! গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যখন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তখন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।" তখন গোবিন্দ ক্রোন্দন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে

উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।” ইহাই বলিয়া স্নান করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের সেবার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন ও আপনার প্রধান শিষ্যের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পন করিলেন। অগ্রদ্বীপেই ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল। গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের অন্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ,—তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়,—রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্মচক্ষু দিয়া বিন্দু-বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগে রোদন করা কর্ত্তব্য, গোপীনাথ এ কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি কেন করিবেন?

গোপীনাথ নূতন সেবাইতকে নিশিযোগে বলিতেছেন, “গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি একমাস অশৌচ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইবা।” তখন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, সত্য কি আমার সহিত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কি রূপে কাচা পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন।” তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, “আমি আমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শাস্ত্র মত সর্ব্বসমক্ষে সমুদয় কার্য্য করিব, ও নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সমুদয় কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।” সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের

করুণায় গদগদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার কথা কি ? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা যাউক। তখন এই কথা সর্ব্বদেশে প্রচার হইল। মধুমাসে কৃষ্ণ-একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল। তখন কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ভাবে অভিভূত হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা ঘোষঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনি ঠাকুর, যেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুত্র। কথিত আছে যে সর্ব্বসমক্ষে গোপীনাথ নিজ হস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত-ভক্তগণ এই পিণ্ডদানরূপ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন। কিন্তু গোপীনাথ চারিশত বৎসরের অধিক কাল গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত-পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন, "হে গোবিন্দ ! তোমা দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরূপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না।" হায় একথা কাহাকে বলিব ? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ এই চারিশত বৎসরের অধিক কাল করিতেছেন ! জয়দেব "দেহি পদ পল্লব" পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরূপে লিখিবেন যে, শ্রীভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং

আসিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন! জীবগণ কি নির্ব্বোধ! কি মূঢ়মতি! এরূপ প্রভুকে ভুলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বৃন্দাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতেও সহস্রেক লোক আসিতেছে। ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতুঃপার্শ্বে লোকের কোলাহল হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল নৃত্য, গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ হয় নাই, যেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহ্বল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা, যদিও লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। এইরূপে মহা কলরব ও হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গৌড়নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভয় পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের ভয়ও তত অধিক। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা বড় ভাগ্যবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়টী রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন? লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সশঙ্কচিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। রাজা হোসেন সাহ যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদয় হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্ব্বাহ করিতেন। কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্ন্যাসী জনকয়েক চেলা লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশব ছত্রির মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা

জানিতে পান যে, প্রভুর সঙ্গে লক্ষলোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্রি যদিচ ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী আর দুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। এই দুই জন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, বাঙ্গালা দেশে বাস করেন। ইহারা দুই ভাই বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা হিন্দুদেবতার মন্দির ভগ্ন করিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য ইঁহারা দুই ভ্রাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে পালন করেন, পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোরাত্র পূর্ণ থাকে। বাড়ী কানাই-নাটশালা গ্রামে। এই কানাইনাটশালা প্রভু পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।

যখন গয়া হইতে প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।* এই সমগ্র কানাইনাটশালা গ্রামে কৃষ্ণলীলার মূর্ত্তি

* প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রভুর দুই ভাব—ভক্তভাব ও ভগবদ্‌ভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া উচিৎ তিনি তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই, ভক্ত যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রভু এই লীলা দ্বারা তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আসিত। এই সকল কীর্তিও সেই দুই ভ্রাতার, যাঁহারা উপরে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। দবিরখাস ও সাকর মল্লিক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সন্ন্যাসীর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা যদিও প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, বোধহয় স্বয়ং শ্রীভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতেছেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাঁহার কৃপায় অধীশ্বর হইয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে মুসলমান রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতি নম্র হইয়া বলিলেন, "আমারও ঐরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্ত্তা। কিন্তু আমি যদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈন্যগণ যদি ছয় মাস বেতন না পায়, তবে তাহারা আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিবে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লক্ষ লোক আহার-নিদ্রা-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আজ্ঞাবহ হইয়া ফিরিতেছে, ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত সামান্য জীবের এরূপ শক্তি সম্ভাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু দুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার নিকট থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পর তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়াও দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ

করিয়াছেন। এখন তিনি নিকটে আছেন ও তাঁহার দর্শন সুলভ হইয়াছে, এরূপ সৌভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন? সুতরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইয়াছে, তবুও কেহ ঘুমান নাই; সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন! অনেক কষ্টে কোন কোন পার্ষদের ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তখন তাঁহাদের কাছে অতি দীনভাবে প্রভুর দর্শন-ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য ইহাদের পরিচয় পাইবামাত্র ভক্তগণ তটস্থ হইলেন। এই দুই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন। বিশেষতঃ তাঁহারা ধনবান ও ক্ষমতাবান বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভাইকে অতি যত্নে প্রভুর নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভু তখন কৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমগ্ন। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্টচিত্ত ভঙ্গ করিয়া, দুই ভাইয়ের আগমন-বার্ত্তা তাঁহার গোচর করিলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। তখন দুই ভাই দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে এক গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর বলিলেন, "প্রভু", পতিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তুমি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র আর পাইবে না। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তারা নির্ব্বোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের ন্যায় অধমের তোমার কৃপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান্ সে তাহা

ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। এই দুই ভাই গৌড়দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতাপুরুষ, সুতরাং দীনতাই তাঁহাদের ঔষধ। তাঁহারা দৈন্যের অবতার হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ নরকে পড়িয়া আছেন, সে জ্ঞান তাঁহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে যে এরূপ ভগবৎভাগ্য পাইয়াও তাঁহারা বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই অনুতাপ তখন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা প্রভুকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। তাঁহারা তখন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, আর তাঁহাদের ক্ষমতা ও পদ বাদসাহের পরেই। তাঁহাদের এইরূপ নিষ্কপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্য-পত্র লিখিয়াছ তাহা দ্বারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি একটী শ্লোক রচনা করি। ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শ্লোকটী বলিলেন। যথা—

"পরব্যসনিনী নারি ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং"।

প্রভুর শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—"যাঁহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। লোক বলে যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। কৃষ্ণপ্রেম যে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া-রস ব্যতীত অন্য উপমার দ্বারা, জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদায় অপবিত্র বোধ

হয় না। শ্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীদের লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভুকে দেখাইতেন। কিন্তু যাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্যা বলিয়া তাঁহাদের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদয় বিধি পবিত্র লোকের জন্য।

সে যাহাহউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়, এমন কি এই গৌড় সান্নিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই "সনাতন ও রূপ" নামে খ্যাত হইবে।

যখন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন—কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ ও সনাতন তাহা বিশ্বাস করিলেন, করিয়া প্রভুকে দৈন্য-পত্র লিখিলেন, অর্থাৎ পত্রেই আপনাদের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য প্রভু উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন আবার লিখিলেন, তবু প্রভু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এই দুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভুর দুই চারিটী কথায় দুই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর দাস হইলেন। এরূপ অচিন্ত্যশক্তি জীবে সম্ভবে না। এই দুই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজ্যমন্ত্রী ; যুদ্ধপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দস্যুবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন, আর অমনি তাঁহাদের পুনর্জন্ম হইল। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রেই কি না করে, যাহার নিমিত্ত তাঁহারা দুই ভাই নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়াছেন, এখন প্রভু-দর্শনে সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্য মলের ন্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই দুই ভাই

কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠ সনাতন এই কথা বলিলেন, "প্রভু, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সুখ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ প্রভুকে গোপনে বলিলেন, যদিও প্রভু স্বয়ং ভগবান সকলের কর্ত্তা, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের ভয় যায় না। প্রভুকে এ স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।"

প্রভাতে প্রভু আপনি বলিলেন, "কল্য নিশিযোগে সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভালরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি যাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাঁহারা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিবারণ করিতে পারি না। আমি এখান হইতে নীলাচলে ফিরিব। আর সেখান হইতে বৃন্দাবনে যাইব।" ইহাই বলিয়া প্রভু পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভবভূতি বলিলেন, মহাজনের মন যদিও শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, কিন্তু প্রয়োজন হইলে উহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখ। কোথা নীলাচল, আর কোথা গৌড়। যে বৃন্দাবনের নামে প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে যাইবার জন্য, দুই মাস হাঁটিয়া বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটি কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্য, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া প্রভু এ সমুদয় পরিশ্রম ও কষ্টের ফল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নরোত্তম দাস" বলিয়া কয়েক বার ডাক

দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যদি প্রভু শুধু "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম নরোত্তম। কিন্তু "নরোত্তম দাস" শুনিয়া কেহ কিছু ঠাহরিতে পারিলেন না। তাহার বহু বৎসর পরে সেইস্থানে যখন শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু "নরোত্তম দাস" বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভু পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীখণ্ডের পর অগ্রদ্বীপে আইলেন। সেখান হইতে নদীয়ায় না যাইয়া দ্রুতপদে একেবারে শান্তিপুরে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু শান্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছু দিন থাকিবেন। প্রভু যে গৌড় হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, এ কথা কেহ কেহ কোন প্রকারে পূর্ব্বে জানিতেন। সে বড় রহস্যের কথা। বৃন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া যাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভুর গমন সুলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটি জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের দুই ধারে সুগন্ধি কুসুম শোভিত বৃক্ষ সমুদয় রোপন করিলেন, তাহার উপর কোকিল ও ময়ূর বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যহ লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক শ্রীপদের নিম্নে একটি পদ্মফুল রাখিতেছেন, যেন উহাতে ব্যথা না লাগে। ব্রহ্মচারী এইরূপে প্রভুকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জাঙ্গাল বান্ধিতে পারেন না। বহুকষ্টেও জাঙ্গাল বান্ধিতে না

পারিয়া, বুঝিলেন যে প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না। তখন তিনি এ কথা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না, কানাই-নাট-শালা হইতে ফিরিবেন। উপরে ব্রহ্মচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে "মানসিক-সেবা"। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভজন।

শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী সাধারণের চক্ষে, বড় দুঃখে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাঁহার অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না। যেহেতু প্রভু যেই তাঁহার নিকট বিদায় লইতেন, অমনি তিনি কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া সংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব যে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ তিনি মথুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, কৃষ্ণ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দময় হয়। বিরহ বড় দুঃখের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ বড় সুখের সামগ্রী। সুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন, ইনি বিদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাখেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আসিয়াছ, আমার কৃষ্ণের সংবাদ বলিতে পার?" একথা শুনিয়া কেবল তাহার কেন, যে কেহ শুনিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কখন বা শচী, যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে চলিলেন, কখন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি

না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর ন্যায়।

শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, সেখানে তাঁহার নিমিত্ত কিছুদিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার জগতের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুরারী এবং নদীয়ার অন্যান্য ভক্তগণ শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এদিকে প্রভু সঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখিয়া অদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ওদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলায় বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর প্রভু উঠিয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি কৃপাময়ী, স্নেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্তুতি করিতেছেন, আর রোদন করিতেছেন। শচী হাঁ করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী পূর্ব্বে যাহা একবার বলিয়াছেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।"

শচী অভ্যন্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর দুই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাসেন, শচী তাহা জানেন, তাই সেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করা

হইয়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড় রুচি—বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন। প্রভু শাক ভালবাসেন, তাহাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক"। প্রভুদ্বয় ভোজনে বসিলে, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, আর শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্য কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে নানাবিধ শাক দেখিয়া, "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি শাকের পক্ষপাতি বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। এই যে হেলাঞ্চা শাক, ইনি দেহ রক্ষা করেন, আর পরোক্ষে কৃষ্ণভক্তি দান করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্য শ্রীশাকের গুণবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্তু শাক ভোজনে রাধারাণীর কৃপা হয়।" হায়! যদি বাস্তুশাক ভোজনে রাধাকৃষ্ণের কৃপা হইত তবে দুবেলা এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্যকৌতুকে ভোজন সমাপ্ত হইল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভুর যদিও সত্বর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্রনির্য্যাণ তিথি সম্মুখে। মাধবেন্দ্র অদ্বৈত প্রভুর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বস্বনিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভু সেই মহোৎসবের অনুরোধে আর কয়েক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভু

গৌরীদাসের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনায় গমন করিলেন। তখন শীতকাল প্রায় গত হইয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কষ্ট পাইতেছেন। প্রভু তখন কালনায় এই অদ্ভুত কথা বলিলেন, "বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, একবার নাম-কীর্ত্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক।" তাহাই এই গীতের সৃষ্টি হইল—"হরিবল জুড়াক্ হিয়ারে।" বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভু। গৌরীদাসের ওখানে মহামহোৎসব হইল। গৌরীদাস নিতাইগৌরের চরণে পড়িয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা দুইজনে তাহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। তথাস্তু বলিয়া দুই ভাই ঠাকুর-ঘরে রহিলেন। পাছে প্রভু পলায়ন করেন এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুর-ঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌরনিতাই দুই ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়া। তখন তাড়াতাড়ি ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে, যে জীবন্ত-ঠাকুর তিনি ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গৌরদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইহাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবন্ত ঠাকুরদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের দুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পূর্ব্বে যাঁহারা বিগ্রহরূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরদাস যা পাইলেন তাহাই রাখিলেন,—ভালই পাইলেন। জনশ্রুতিতে যেরূপ কাহিনী শুনা যায়, তদ্রূপ বলিলাম। কিন্তু পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ (যিনি উৎকল উদ্ধার করেন) রচিত এই তিনটী পদ আছে। যথা :—

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকানগরে থাক, এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি, রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি, তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি, তবে জানি পতিত-পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ, প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস, ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়, তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ, দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুইজনে, ভকত বৎসল তেঁঞি গায়॥

(২)

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, রহিলাম এই দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই খানি মূর্ত্তি লৈয়া, আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে, সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ, চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বূলাদি সমর্পিয়া, সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা॥
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত, দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খায় মাগি, দোঁহে গেলা নীলাচলপুরে॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা, সেই মত করয়ে-বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

(৩)

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম, তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, অম্বিকা নগরে যার বাস॥

নিতাই চৈতন্ত যার, সেরা কৈলা অঙ্গীকার, চারি মূর্ত্তি ভোজন করিলা।
পুরুষে সুবল যেন, বশ কৈলা রাম কানু, পরতেক এখানে রহিলা॥
নিতাই চৈতন্ত বিনে, আর কিছু নাহি জানে, কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে, নিতাই চৈতন্ত দুই ভাই॥
প্রেমে লক্ষ ঝম্প যার, পুলকিত হুহুঙ্কার, ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

প্রভু শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সমুদায় শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎসবের সঙ্গে প্রভুর নদীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিদায় লইলেন। শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষের এই শেষ দেখা। যেহেতু শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্ব্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই কায়স্থ ইহারা বার লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যখন শান্তিপুরে আইসেন তখন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ৫।৭ দিন প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং সংসারে বাস অসহ্য হইয়া পড়িল। প্রভু সেখান হইতে নীলাচল গমন করিলেন। রঘুনাথ বারংবার সেখানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, আর ধরা পড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতিপূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে অনেক কৃপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদায় করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষয়

ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একেবারে সাধু হয় না, তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন। ইহাই বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে গৃহে বিদায় করিয়া দিলেন। হে গৃহী-পাঠক-মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভু সেখান হইতে কুমারহট্টে আসিলেন। শ্রীবাস তখন তাঁহার কুমারহট্টস্থ আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সহিত নিজগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু অবশ্য শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেম। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার-যাত্রা সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সঙ্কল্প।" শ্রীবাস এই সঙ্কেত দ্বারা ইহাই বলিলেন, "একদিন, দুইদিন, তিনদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিব। ইহাতে যদি কৃষ্ণ অন্ন না দেন, তবে গঙ্গায় প্রবেশ করিব। প্রভু ইহাতে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রীভগবানে এত বিশ্বাস! আচ্ছা আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও উপবাস করেন, তবু তুমি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে না!" শ্রীবাসের দৌহিত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন; "তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই।" প্রভু সেখানে হইতে তাঁহার মাসী ও মাসীপতি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ছেলে, তাই অভ্যন্তরে গমন করিলেন। এমন সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"কেন, কি হইল ?" তখন শুনিলেন, সেই যুবতী শ্রীখণ্ড ভগবান আচার্য্যের স্ত্রী। শ্রীভগবান আচার্য্য "প্রভুকে না দেখিলে মরেন"। এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া, স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া, নীলাচলে প্রভুর নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভু এই সমুদায় কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি সত্যই পুত্রবতী হইবে।" ইহার পর প্রভু নীলাচলে গমন করিয়া ভগবানকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র সন্তান হইলে তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিও। এই আজ্ঞায় শ্রীভগবান দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার দুইটি মহাতেজস্বী পুত্র হইল।

প্রভু নীলাচলাভিমুখে দ্রুত চলিলেন। পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে দুই এক দিবস রহিলেন। সেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে দ্রুতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেত্রের লোক প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আইলেন। গদাধর প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার মুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন তিনি ধন্য, আর যিনি মূর্চ্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ।"

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইয়া

বৃন্দাবনে যাওয়ার সুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গেলে লোক ভাবিবে যে, আমি বাজিকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বৃন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভৃত পবিত্র স্থান, সেখানে একা যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিরস্ত হইলাম। আমি তখন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে দুঃখ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে আমায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উহাতে গদাধর কৃতার্থ হইয়া গলায় বসন দিয়া চরণে পড়িলেন ; পড়িয়া বলিলেন "প্রভু, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৃন্দাবন আর কোথা ? যেখানে তুমি সেইখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি ? সম্মুখে চারিমাস বর্ষা আসিতেছে, ইহার অন্তে আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, "পণ্ডিতের যে মত ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত।" তখন প্রভু গদাধরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার-কার্য্যের জন্য গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, তাঁহারা এবার যেন আর নীলাচলে গমন না করেন। সুতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভু কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমায় বলরে, কতদুর বৃন্দাবন আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন ॥

গৌর-উক্তি—প্রাচীন গীত।

প্রভু যখন শান্তিপুরে শচীমাতার নিকট বিদায় হয়েন, তখন বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইতে পারিলাম না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম"; ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনীর ন্যায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন এবং বদন হেঁট করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রভু শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন কিন্তু শচীর মনে একটি কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল—"নিমাই কান্দিল কেন?" যাইবার সময় কান্দিল কেন?" শচী আপনা-আপনি এই কথা প্রথমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ক্রমে মুরারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"নিমাই যাইবার বেলা এরূপ কান্দিল কেন? তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। ঠাকুর জননী-বৎসল, তাই বিদায় কালে কান্দিয়াছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহা নয়, তোমরা নিমাইয়ের কি বুঝ? নিমাইয়ের সঙ্গে বিদায়ের বেলা যখন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে আর একটি কথা বলিয়াছিল। তাহার অর্থ—"মা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা

হইবে না। তা না হইলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন?” “যাইবার বেলা কেন কান্দিল” বলিতে বলিতে শচী নবদ্বীপে গমন করিলেন, সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর।

প্রভুর মুখে এক কথা, আর মনেও সেই এক ভাব যে, “কবে বৃন্দাবন যাইব? কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা কৃষ্ণ-বিহারের স্থান? কবে আমার বৃন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি বনস্থলীতে গড়াগড়ি দিব? যমুনায় স্নান করিব?” প্রভুর এইরূপ আক্ষেপ-উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

প্রভুব ছল-ছল আঁখি, ম্লান বদন। স্বরূপকে নিকটে ডাকিলেন। স্বরূপ আসিলে, প্রভু অমনি তাঁহার হাত দু'খানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন “স্বরূপ, আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য কর, তোমায় মিনতি করি।” স্বরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও প্রভু নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐ এক কথা,—আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হবে?” রামরায়ও আশ্বাস বাক্য বলিলেন। প্রভুকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভু তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ঘটিবে?” এইরূপে প্রভুর দিবানিশি কাটিতে লাগিল। ভক্তগণের মনে হইল যে, বৃন্দাবন না দেখিলে প্রভু প্রাণে মরিবেন। “বৃন্দাবন, বৃন্দাবন,” করিয়া প্রভু রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভুর অবতার; কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ

৩

করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য একজন ব্রাহ্মণ-ভৃত্য সঙ্গে করিয় তীর্থ পর্য্যটন আশায় নীলাচল আগমন করিয়াছেন। ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির হইল। দিনও স্থির হইল। প্রভু আবার বিজয়া-দশমী দিনে অতি প্রত্যুষে বৃন্দাবন চলিলেন। লোক সংঘটন ভয়ে প্রভুর গমনবার্ত্তা দুই চারিজন মর্ম্মী-ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাখিয়া নিবিড় বনপথে ঝাড়িখণ্ড দিয়া চলিলেন। প্রভুর সঙ্গী-দুইজনের সহিত এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চলিয়াছেন। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহ্বল অবস্থায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে যাইতেছেন। মধ্যাহ্ন সময় হইলে সঙ্গিগণ প্রভুকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রভু পুত্তলিকার ন্যায় সেখানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রয়-স্থান নাই, অমনি বনে রহিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠের অভাব নাই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝাড়িখণ্ডে এখনও বনপশুর ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, তখন সেখানকার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন। প্রভু যে পথে চলিলেন, সে পথে কেহ কখন যায় নাই, কাহারও যাইতে সাহসও হয় না। প্রভু নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন, ১০।১৫ দিনের পথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবশ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রভুর হিংস্র জন্তুগণের প্রতি লক্ষ্যও নাই। বন্যপশুও আসিল, প্রভুকে দর্শন করিয়া, হয় ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া

থাকিল। প্রভু স্নান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুথ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কৃতার্থ হইয়া, অতি নম্রভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কখন কখন বা ব্যাঘ্র আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মৃগ প্রভৃতিও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই রূপে ব্যাঘ্র ও মৃগে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংস্র জন্তুগণের মনেও কোমলভাব আছে। দেখ না, ব্যাঘ্র পর্য্যন্তও আপন শাবককে লইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য কুকুরের হিংস্র ভাব, আর পালিত কুকুরের প্রভুভক্তি দেখ। অবশ্য বন্য কুকুরের হৃদয়ে এই কোমলভাবের অঙ্কুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাসে ক্রমে লালিত পালিত হইয়া সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। যদি ভারি বন্যা হয়, তবে কেহ কাহার হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের হিংস্রভাব দূরীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংস্রভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কাজেই ব্যাঘ্র ও মৃগ মুখ শুকাশুঁকি করিতে লাগিল। এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রভুর সঙ্গিগণ অবাক হইলেন এবং প্রভুও সুখী হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। প্রভু গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগৎ সুশীতল হইল। পক্ষী সকল আনন্দে সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণনাম করিলেন, আর যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল, বৃক্ষলতা কুসুমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু একদিন সহজ অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন. "কৃষ্ণ কৃপাময়, এই বনপথে আমাকে আনিয়া বড় সুখ দিলেন।" প্রত্যহ বন্য-ভোজন, সর্ব্বদা জনশূন্যতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়ূরের নৃত্য, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, বনের

শোভা, এই সমুদায় প্রভুকে মোহিত করিল। প্রভু কখন কখন বন ত্যাগ করিয়া গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোকসমাজ অতি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় হিংস্র। কিন্তু তবু প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মত্ত হইতেছে। এমন কি, গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে। এইরূপে প্রভু বারাণসীতে মনিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটী অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পরম মধুর ও পরম স্নিগ্ধ বস্তু প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোনার ন্যায়, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, তাঁহার চক্ষু কমলদলের ন্যায় করুণা মকরন্দ পূর্ণ, তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্র হইতেও সুখকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া, বিহ্বল অবস্থায় কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে, তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন। সেই পরম শুভদর্শন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদয় লোকের নয়ন অন্য দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুখে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। কেহ বা আকৃষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে লাগিলেন,—"ইনি যিনিই হউন, আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন।"

এই সমুদয় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে প্রভুকে দেখিয়াছেন। প্রভুর দোসর জগতে নাই, সুতরাং যিনি একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। এই লোকটীও কাজেই দর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন। তখন তিনি দ্রুতগমনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাপার গমন করেন, তখন সেই দেশের একজন প্রধান লোক, প্রভুকে শ্রীভগবান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে

বারাণসী গমন করিতে আদেশ করেন ; বলিয়াছেন যে "তুমি তথায় গমন কর, তোমার সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে।" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন সম্পূর্ণ হইল। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষের দুই প্রধান স্থান। নদীয়া ন্যায়ের স্থান ; কাশী বেদের স্থান। নদীয়ায় তন্ত্র-চর্চ্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহী পণ্ডিতের এবং কাশী সন্ন্যাসী পণ্ডিতের স্থান। এই সন্নাসীগণের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাত্মচর্চ্চায় ইনি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। যদিচ ন্যায়শাস্ত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড়, কিন্তু সরস্বতী আবার বেদে সার্বভৌম অপেক্ষা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের দুই প্রধান কণ্টক—নৈয়ানিকগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্ব্বভৌম প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। এখন মায়াবাদিগণের সর্বপ্রধান প্রকাশানন্দ বাকী আছেন। সেই মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহার নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভুর অবতারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন ; শুনিয়া প্রথমে কেবল হাস্য করিয়াছেন। তাহার পর শুনিলেন যে, প্রবল-প্রতাপান্বিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তখন একটু উত্তেজিত হইলেন ; ভাবিলেন, এই নব-অবতারটীকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া একটি তৈথিক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।* পত্রখানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই, বরং

* প্রভু প্রকাশানন্দকে লইয়া যে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিয়া আমি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছি। এই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মূলঘটনা মাত্র লিখিলাম।

বিস্তর অবজ্ঞাসূচক বাক্য ছিল। সেই পত্রখানিতে একটি শ্লোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মূঢ়লোকেই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভুও এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটী শ্লোক পাঠাইলেন। প্রভুর পত্র শিষ্টাচার-পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর একটী শ্লোক লিখিলেন। তাহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিবারণ করিবে?" প্রভু এই শ্লোকের কোন উত্তর দিলেন না।

অতএব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভু কাশীতে আসিলে সে কথা প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসীগণের সহিত সর্ব্বদা ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিত্ত সমর্পন করিয়া দ্রুতগমনে এই শুভ-সংবাদ কাশীর সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাকে বলিতে চলিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন যে এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মনুষ্য নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুকে জানেন ও ঘৃণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণ বর্ণনা শুনিয়া মাৎসর্য্যে জ্বলিয়া গেলেন; বলিলেন, "জানি জানি তাহার নাম চৈতন্য। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে প্রবলপ্রতাপান্বিত পণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌমও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার

ভাবকালি এই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে দুই কুল নষ্ট হয়।”

কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এ কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আসিয়া সমুদায় কথা বলিলেন ; বলিলেন, “প্রভু, এই গর্ব্বপূর্ণ সন্ন্যাসী বলে কি যে, তোমার ভাবকালী এই কাশীনগরে বিকাইবে না।” প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকায় অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।” মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন, “প্রভু, আর এক তামাসা শুন্থন। সে আপনাকে বেশ জানে ; দেখিলাম আপনার উপর ভারি রাগ, এমন কি আপনার নামটা পর্য্যন্ত করিলে তাহার সহ্য হয় না। সে তিনবার আপনার নাম করিল, তিনবারেই বলে ‘চৈতন্য’,—‘কৃষ্ণ-চৈতন্য’ একবারও বলিল না।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন, “সে রাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল ‘আমি ঈশ্বর’ ‘আমি ঈশ্বর’ ইহাই ধ্যান করে তাহাদের মুখে সহজে কৃষ্ণ-নাম আইসে না। যাহা হউক, প্রভু পরদিন বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু কাহাকেও লইলেন না। প্রয়াগে আসিয়া প্রভু সত্যই যমুনা দর্শন করিলেন। সেবার প্রভু জাহ্নবীকে যমুনা বোধ করিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবার সত্য সত্যই যমুনা প্রভুর সম্মুখে,—যে যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিচরণ করিয়াছেন, আর গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রভু ছুটিলেন, এবং যমুনার তীরে আসিয়া অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শীতকাল তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিন্তু প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, আর উঠিবেন কেন? তখন বলভদ্র ভয় পাইয়া ঝাঁপ দিয়া প্রভুকে

উঠাইলেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, যমুনা দর্শনে প্রভুর অঙ্গ একেবারে প্রেমে এলাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রভুর আগমন-বার্ত্তা প্রয়াগে ছড়াইয়া পড়িল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে আসিতে লাগিল, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকটে থাকিয়া গেল। প্রভু যে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, সে তিন দিন কেবল হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যেখানে রহিতেছেন, সেইখানেই প্রভুর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু দক্ষিণ দেশে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু (যাহা চরিতামৃতে)—

"পথে যাঁহা হয় যমুনা দর্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥"

প্রভু আনন্দে যমুনায় ঝাঁপ দিতেছেন; আর যদিও শীতকাল তবুও উঠিতেছেন না। প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। অবশেষে সত্য সত্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর এক ক্ষোভ ছিল, তিনি বৃন্দাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোভ জ্বলন্ত অঙ্গাররূপে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাই জনা-জনার গলা ধরিয়া এই বলিয়া রোদন করিয়াছেন,—"আমি কবে বৃন্দাবনে যাবো, কবে বৃন্দাবনের ধূলায় ভূষিত হবো। তখন প্রভু বৃন্দাবনের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, বৃন্দাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইহাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন,—"কাঁহা বৃন্দাবন; কাঁহা বেহুলাবন; কাঁহা আমার ভাণ্ডীরবন; কাঁহা আমার মধুবন; কাঁহা যমুনা-পুলিন; কাঁহা গোবর্দ্ধন; কাঁহা শ্রীদাম সুদাম, কাঁহা নন্দ যশোদা কাঁহা—" বলিতে বলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম আর মুখে আসিল না,

অমনি ঘোর মূর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়িলেন। সে ছয় বৎসরের কথা। এই ছয় বৎসর, "কবে বৃন্দাবনে যাইব" দিবানিশি এই চিন্তা এই যুক্তি করিয়াছেন। একবার চারিমাস বৃন্দাবনে যাইবার পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ সত্যই সেই বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, নিতাই, স্বরূপ প্রভৃতি আপদ-বালাই সঙ্গে থাকিলে, তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এবার প্রভু একা, আপন মনে যাইতেছেন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে বৃন্দাবনের নাম শ্রবণে প্রভু বিহ্বল হইতেন, সেই বৃন্দাবন এখন সম্মুখে।

প্রভু শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন, অমনি হঠাৎ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, এবং উঠিয়া হুঙ্কার করিয়া বিশ্রামঘাটে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর হুঙ্কারে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সংঘট হইতে আরম্ভ হইল। লোকেরা কৌতুক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কোলাহল করিতেছে। এইরূপে মথুরায় আসিবামাত্র মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা একেবারে অবাক হইলেন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহার দর্শনমাত্রে লোকে প্রেমে উন্মত্ত হয়, তিনি তো সামান্য জীব নন! এ 'বস্তুটী কে? তবে কি আমাদের কৃষ্ণ আবার আসিলেন? কাহার মনে এরূপও উদয় হইল যে,—ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধবেন্দ্রপুরীর গণ ব্যতীত আর কেহ জানেন না। সকলে হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু ঐরূপ নৃত করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য

আরম্ভ করিল। এইরূপে দুই প্রহর গত হইল। তখন মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ,—নাম কৃষ্ণদাস। তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে?" তাঁহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভালমানুষ ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য, অতএব তাঁহার পূজ্য। তখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণদাস জাতিতে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসীগণ এরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি সনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন, তবে লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন, ধর্ম্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। পুরী গোসাঞী তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এই আমার ধর্ম্ম।"

প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনা করে ত্রিজগতে এ সাধ্য কাহারও নাই। কেবল "শ্রীবৃন্দাবন" এই নাম শ্রবণে প্রভুর অন্তরে যে রসের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া যায়, সেই প্রভু আপনি সেই বৃন্দাবনের মাঝখানে! দূরদেশে থাকিয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের একমাত্র রজ পাইলে তাহা লইয়া একমাস আনন্দে যাপন করিতেন। এখন প্রভু বৃন্দাবন-ভূমিতে।

শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ-মাত্র প্রভুকে আনন্দে উন্মত্ত করিত; এখন ইহার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক গুল্ম, প্রত্যেক পাতা প্রভুর চিত্তকে আনন্দ দিতেছে। প্রভু যমুনার নামে মূর্চ্ছিত হইতেন, অদ্য সেই যমুনা সম্মুখে। প্রভু যমুনার জল পান করিতেন, কিন্তু পান করিয়া তৃপ্তি হইতেছেন না। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না। প্রভু বৃক্ষ দেখিলেই উহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; আলিঙ্গন করিয়া, অতি প্রিয়জনের আলিঙ্গনে যে সুখ তাহাই অনুভব করিতেছেন; সুতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতে চাহিতেছেন না। প্রভু এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মাঝে। প্রভুর দুঃখ এই যে,—তাঁহার মোটে দুটী চক্ষু ও দুটী কর্ণ, একটি দেহ ও একটি চিত্ত। প্রভু একটি ছিন্ন-পত্র লইয়া ব্যথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ মূর্চ্ছা প্রভুর ঘন ঘন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর এরূপ ঘোর-মূর্চ্ছা হইতেছে যে, সঙ্গীরা ভীত হইয়া তাঁহারা সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ কথা সঙ্গীত, আর সহজ চলন নৃত্য। শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীবৃন্দাদেবী যেন তখন জানিতে পারিলেন যে, বহুদিন পরে তাঁহার প্রাণনাথ আসিয়াছেন নতুবা সমস্ত বৃন্দাবন প্রফুল্লিত হইবে কেন? লতা বৃক্ষ সজীব হইবে কেন? অকালে বসন্তের উদয় হইবে কেন? যথা পদ—"বৃন্দাবনে উপনীত, তরুলতা কুসুমিত"—ইত্যাদি।

প্রভুর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। বহিরঙ্গ লোকে দেখিতেছে যেন

বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুসুম শাখা হইতে আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়, প্রভুর মস্তকে যে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটিও পুরাতন নয়। প্রভুর মস্তকে বাসী-ফুল, তাহা কি কখন হইতে পারে? প্রভুর মস্তকে আবার কুসুম-মধু ক্ষরিতেছে, আর কোথা হইতে মধুকর আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া গুন্-গুন্ শব্দ করিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাঁহার প্রাণ।—আজ না, কাল না, চিরদিনের নিমিত্ত। এমত স্থলে যেরূপ প্রেমের তরঙ্গ সম্ভব, তাহাই বৃন্দাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব বহু-বল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। বৃক্ষলতার দশা যখন এরূপ, তখন প্রাণিমাত্রেও কিরূপ, তাহা অনুভব করা যায়। ময়ূর-ময়ূরী প্রভুর অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া যাইতে লাগিল। শুক-সারী আসিয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বসিতে লাগিল,—উড়িবে না, তাহাদের ভয় নাই। ভৃঙ্গপাল তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহাদের ভাষায় তাহার গুণ গান করিতে লাগিল। মৃগযূথ আসিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিল। প্রভু মৃগের গলা ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন, আর অমনি তাহাদের নয়নে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল। প্রভু শুক-সারীর সহিত আলাপ করিতেছেন, ময়ূর-ময়ূরী অগ্রে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সম্মুখে দেখেন বহুতর গাভী রহিয়াছে।

"অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্যামলী, অমলি, বিমলী প্রভৃতির সেখানে আবির্ভূত হইল। প্রভু হুঙ্কার করিলেন; গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভুর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভু বহুবল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভুকে ঘিরিয়া নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খ গো-রক্ষকগণ এ সমুদায়ের কোন তথ্য জানে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল; কিন্তু গো-পাল প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রভু

চলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চলিল। প্রভু গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় স্নেহদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার বদন বাহিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। তাহারাও প্রভুর প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় চাহিতে লাগিল,—তাহাদেরও আনন্দধারা পড়িতে লাগিল।

প্রভু এ-বৃক্ষতল হইতে ও-বৃক্ষতলে, এ-বন হইতে ও-বনে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন,—তাঁহার সর্ব্বশরীর আনন্দে তরঙ্গায়মান হইতেছে। কখন রাধা-ভাব, কখন কৃষ্ণ-ভাব। মনানন্দে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ-বোল।" বৃন্দাবনে হরিবোল নাই। হরি বড় দূরের সমগ্রী। বৃন্দাবনে বুলি "কৃষ্ণবোল।" প্রভু কৃষ্ণ-বোল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণ—আনন্দ। শ্রীবৃন্দাবনের যিনি নাগর, তাঁহার নাম কানাইলাল, কৃষ্ণ, নটবর—শুনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তিনি কি করেন? না—নিধুবন, ভাণ্ডীরবন, মধুবন, তালবন, বেহুলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি যমুনা-পুলিনে বসিয়া নিজ-মনে বেণুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি—যমুনা-পুলিন, ধীরসমীর, গোচরণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ুরপুচ্ছ। হে পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবৃন্দাবন তোমাতে স্ফূর্ত্তি হউক, আমি বৃন্দাবন বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই বৃন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

চণ্ডীদাস "পিরীতি" এই তিনটি অক্ষরের পূজা করিয়াছেন, কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ণ-অধিকারী, এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ, তাঁহার হৃদয় প্রেমে জর-জর। এই

প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ সৃষ্টি। তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আচ্ছা শ্রীভগবান কি করেন? কেমন করিয়া তিনি দিবানিশি যাপন করেন? তাঁহার কি বিরক্ত হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাঁহার সময় কাটান দুরূহ ব্যাপার হয়?

ইহার উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রস্রবণ। তাঁহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা হইতে অজস্র পীযুষ-ধারা বহিয়া থাকে। সুতরাং যাহা প্রেমের ছায়া মাত্র, তাহা হইতে যখন এত আনন্দ, তখন তাঁহার সেই অখণ্ডপূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এ জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছায়ার কি কি আছে দেখুন। জননী শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশুসন্তানটী লইয়া অনন্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। যখন কোন কার্য্য নাই, তখন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই সুখে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক প্রান্তভাগে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া বর ও কন্যা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, আর প্রেমের একটী বস্তু পাইয়া জনক-জননী আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনন্ত মুখ, এক এক মুখে এক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমের সহায়—পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে; আর এ সমুদয় একটী আনন্দের

অকুল সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। যাহার যত প্রেমের বস্তু তাহার ততটী সুখের প্রস্রবণ, তাহার তত সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান আনন্দময়।

এই যে প্রভু আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মুসলমান রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জলমগ্ন হইয়াছে। যে মাসে প্রভু সন্ন্যাস করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে ভূগর্ত্ত ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিবেন। তাহারা আসিয়া শুনিলেন, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে তল্লাস করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রভুকে সমস্ত দক্ষিণ দেশে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ত্তকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার।

প্রভু বনভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন॥ আর অমনি একটি অপরূপ বালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটী পাঞ্জাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ঃক্রম যখন ৭ বৎসর, তখন এক রজনীতে সে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে একটী পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক তাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁর নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার (অর্থাৎ বালকের) বৃন্দাবনে দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল।

তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিল। সুতরাং ধ্রুবের কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ছুটিলেন। এ বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার প্রভু আপনি প্রহ্লাদের লীলা করিয়াছেন। প্রভু তাঁহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। কৃষ্ণনাম বিনা তাঁহার মুখে আর কিছু আইসে না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না; কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়োজন কি? ষণ্ডামার্কের অভাব কি? অভাব প্রহ্লাদের। প্রহ্লাদের কাহিনী সপ্রমাণ হইল, ধ্রুবের বাকী রহিল; তাই লাহোর ধ্রুব সৃষ্টি করিলেন। বালক পূর্ব্ব-দক্ষিণ ছুটিল, আর শ্রীভগবান যেরূপ ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন। সেখানে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট সেই বালক বাস করিতে লাগিল।

বালক বল্লে "আমার গৌরাঙ্গ কোথায়?" লোকে বলে "গৌরাঙ্গ কে? এ কৃষ্ণের স্থান, গৌরাঙ্গের স্থান নয়।" লোকে ভাবে বালকটি অর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত। কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আর তাহাকে অতিশয় সন্তপ্ত দেখিয়া লোকে তাহাকে স্নেহ করে। এইরূপে বহুবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তখন সেই যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইয়াছে) দেখিবামাত্র প্রভুরে চিনিল; বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইঁহার নিমিত্ত সে দেশান্তরী, ইঁহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী উদাসীন; ইঁনিই তাহাকে পাগল করিয়া—দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূরে লইয়া আসিয়াছেন।

বালক ভাবিতেছে, "আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন?" এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার পদতলে পড়িল।

যখন বিদেশিনীরূপে কৃষ্ণ, রাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং তাহার পরে যখন তাঁহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—"এই ত আমার প্রাণনাথ হে! আমি পেলাম, আমি পেলাম,—হারাধনে!"

আবার যখন বহু বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—"বহু দিন পরে, বধু এলে ঘরে।"

উপরে যে দুইটি মিলনের পদ দিলাম, এই যুবক দুই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদায় সম্বরণ করিয়া, মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু যুবককে বলিলেন, "তোমার নাম কৃষ্ণদাস। তুমি যাও, পশ্চিম দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি কাঙ্গাল, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, আমি কি রূপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিব?" প্রভু তাঁহার নিজের গলা হইতে গুঞ্জমালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন; বলিলেন, "এই মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি জীব নিস্তারের শক্তি পাইলেন! কৃষ্ণদাস যেখানে গমন করেন, অমনি লোক আসিয়া তাঁহার শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, তিনি প্রভুকে অল্পক্ষণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতে ভক্তি-ধর্ম্ম কি, সমুদায় তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভুর গুঞ্জমালা পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালা।" তিনি

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা ভক্তমালা গ্রন্থে ঃ—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার॥ অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে। প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে॥

গুঞ্জমালী মালাবারে শ্রীগৌর-নিতাই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বনোয়ারিচন্দ্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহান্ত করিয়া অন্য স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইয়া আবার গৌর নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ শুনিয়া সেখানে গৌড়ীয় শ্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। দুইজনে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এইরূপে সেখানে দুটী গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গৌড়ীয়, চক্রপাণির গাদির নাম ছোট গৌড়ীয় হইল। যথা ভক্তমালে ঃ—

"ছোট গৌড়ীয়া আর বড় যে গৌড়ীয়া। অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥"

সেখান হইতে গুঞ্জমালী নিজদেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়া নামক গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরঙ্গ সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল। যথা ভক্তমালে ঃ—

"পাঞ্জাবের পশ্চিমে নাম সিন্ধু নাম দেশ। উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ॥
হিন্দু ত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিলা। মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা॥
গোসাঞির সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন। বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীর্ত্তন
যবনের আচার ত্যজিল সর্ব্বজন। হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ॥"

সে কালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দূরের কথা, এখন বাঙ্গলায়ও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ এবার স্মরণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকার মধ্যে যাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরলীলায় তাঁহাদের সকলকেই দেখিতেছি।

প্রহ্লাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল, কৃষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন। শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা।

ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্য জনকে নানা উপায়ে বাধ্য করে। কেহ উৎকোচ দিয়া বাধ্য করে। যেমন কালীমার ভক্তগণ কালীমাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোষামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বর্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধ্য করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহ আনুগত্য দেখাইয়াও বাধ্য করে। যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রভুকে কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজ জন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু সর্ব্বজগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহাকে আপন বলিয়া ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, অন্য ভজন কেবল বিড়ম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আছেন, এমন সময় যশোদা দূর হইতে "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে?" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন, "যে ডাক শুনিতেছি এ ব্রজের ডাক, অন্য স্থানের নয়; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রজের ডাক এখন বুঝিলেন কি? "হে দয়াময়!" মথুরার ডাক, আর "হে গোপাল!" ব্রজের ডাক।

কৃষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে। রাসস্থলী দর্শনে হৃদয়ে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসস্থলী কোথায়? রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্তি হয়, কিন্তু সে কুণ্ডদ্বয় কোথায় ছিল? সে সমুদায় লুপ্ত হইয়াছিল, কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভু এই যে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন! এইরূপে তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কোথায়?" কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তখন প্রভু আপনি যাইয়া এক ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হইয়াছে!

প্রভু যখন যে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপন আপনি প্রচার হয়, যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও অবশ্য তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। যখন কৃষ্ণ আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চন-বর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কৃষ্ণ। কিন্তু ইতর লোকে কৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী কাহিনী শ্রবণ করুন।

জনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন, আর তিনি প্রত্যহ রজনীতে যমুনায় কালীয় দমন করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনীযোগে যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু-কিছু দেখে, আবার কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেষে প্রকাশ পাইল যে, জালিয়াগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত আলো জ্বালিয়া নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া মূর্খ লোক উপরোক্ত জনরব

তুলিয়ছে। কিন্তু এরূপ দীপ জ্বালিয়া জালিকগণ চিরদিন মৎস্য ধরিতেছে, কিন্তু এরূপ জনরব পূর্ব্বে কখনও হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এ কথা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছদ্মভাবে আছেন, সুতরাং সকলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিলেন, আর সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য কৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতেছেন ও মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতেছেন। প্রভু কোথায় আছেন, কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানে না। প্রত্যহ বহুলোক আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ইহার তথ্য প্রভু অবশ্য কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটি মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যকে অনুনয় বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা হইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্য জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্য্যের অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার প্রভুকে লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার ভয়। কখন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিক নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরূপে যমুনায় ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন না। তখন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ

হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। অনেক তল্লাসের পর তাঁহাকে পাইলেন ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা তিনি মহামূল্য ধন তাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বৃন্দাবনের বাহির করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সঙ্কল্প করিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?" ভট্টাচার্য্য তখন করযোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, সুতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেখানে যাইব।" এই মধুর বাক্যে ভট্টাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল বরিতে লাগিল। তখন সাব্যস্ত হইল, পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবেন।

প্রিয়স্থান বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রভু অত্যন্ত বিকল হইলেন; কিন্তু মায়া তাঁহার অধীন। মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্র মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার যেরূপ উত্তরমুখে চলে, সেইরূপ যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাঁহার

চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্দ্র বলিয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য এ কথা গোপন রাখিলেন ; যেহেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘটে তাঁহাদের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহায়তার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে ও প্রভুর একটি রাজপুত ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাঁচজন,—যথা, প্রভু, ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য, কৃষ্ণদাস ও রাজপুত ভক্ত।

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন একদিন পথে কোন গোপবালক বেণু বাজাইল। অমনি প্রভু মুর্চ্ছিত হইয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায় ? কিন্তু এই যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভু অপরূপ লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল।

প্রভু মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একজন পরম সুন্দর পাঠান যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী খাঁ। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মগুরু আছেন। তিনি পরম গম্ভীর ও ধাৰ্ম্মিক ; আর কতকগুলি সৈন্যও আছে, সকলেই অশ্বারোহী। প্রভুর রূপ ও তেজ দেখিয়া তাহারা অবশ্য কৌতূহলী হইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হইল যে, এই সন্ন্যাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত উহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তখনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্ব্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া

থাকে। পাঠান রাজপুত্রের যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ দুর্ব্বল, সুতরাং বলপ্রয়োগের এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? জীব নাকি বড় দুর্ব্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন যে তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেখানেই তাহাদিগকে বধ করিবে ইহাই উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হুঙ্কারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকারী বস্তুটি মহাপুরুষ, আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তখন নানা উপায়ে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বসাইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভু পাঠানগণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অবশ্য ভক্তির উদয় হইয়াছে। প্রভু বসিলে তাহারা এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, সকলে আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা কয়েক জন তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার সঙ্গী; আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমার মূর্চ্ছার পীড়া আছে, আর ইহারা কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।"

বিজলী খান তখন অপ্রতিভ হইলেন; তাহার গুরু তখন ধর্ম্মের

কথা তুলিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থূল কথা, ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে কৃপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্ম্মগুরু তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস। যথা চরিতামৃতে :

"তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা। সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি। সর্ব্বত্র গাইয়ে বেড়ায় মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সে বিজলী খান হৈল মহাভাগবত। সর্ব্বতীর্থে হৈল তাহার পরম মহত্ব।"

এইরূপ শক্তিসম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন? এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক ঘণ্টা পরে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে! ইহারা কাহারা? ইহারা মুসলমান, হিন্দুধর্ম্মের পরম বিদ্বেষী।

প্রভু তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না, তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা প্রয়াগ পর্য্যন্ত অবশ্য প্রভুর সহিত যাইবেন। প্রভুর সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়াগে পৌঁছিলেন। সেখানে প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইতে হইবে, কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল সেখানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়াগ লোকারণ্য হইল। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে।"

প্রেমকে বন্যার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল।

এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী দুই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গলা দেশে বাস করেন। স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইর নাটশালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের জাতি গিয়াছে, অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যখন মুসলমানগণ হিন্দুগণের দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরী থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দুধর্ম্মে, তবু ঐশ্বর্য্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া সর্ব্বদা গোষ্ঠি করেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, জলের ন্যায় অর্থ বিতরণ করেন; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু অথচ পরম জ্ঞানী, বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির খাস ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদয় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবা মাত্র তাঁহাদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর তখন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাৎপর্য্য এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের ন্যায় পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।" প্রভু এ

সমুদায় পত্রের উত্তর দিলেন না; তবে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইঁহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইলেন। সনাতন, প্রভুকে বলিলেন যে "বৃন্দাবন যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভু বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার পরে প্রভু আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও কৃষ্ণ অচিরাৎ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভু বৃন্দাবনে না যাইয়া সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার পর শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আসিয়াছেন। এই দুই ভাই, যদিও পূর্ব্বে প্রভুর কথা-মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ বদ্ধমূল হইল। শুধু তাহা নয়, তাঁহাদের ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল। আর চাকরী করিতে পারেন না, এমন কি, ঘরে থাকিতেও পারেন না। তবে রাজার ভয়ে দুই ভাই একেবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী হইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। রাজা তাহার পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া রাজাকে বলিলেন যে, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "তোমাদের দুই ভাইকে লইয়া আমার সকল কার্য্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরূপে?" সেদিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায়

করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চাহিলেন, আর সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিত কেহ করে না, কারণ এরূপ কার্য্যের ফল তখনি প্রাণদণ্ড! কিন্তু সনাতনের তখন প্রাণের মমতা ছিল না, যেহেতু প্রভুর সহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অনুতাপ হইয়াছে। তখন সনাতনের আপনাকে এরূপ ঘৃণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দণ্ড, তাহা তাঁহার আর বোধ নাই। তখন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুতাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, তিনি মরিলেই বাঁচেন। যেরূপ শূলরোগী কি মহাব্যাধিগ্রস্থ লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি," সেইরূপ সনাতনের তখন অন্তরে শূলরোগের ও মহাব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভুর কৃপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। সনাতন ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

রূপ পূর্ব্বেই গৌড় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লোকে অনায়াসে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা কয়েক ভাই কিরূপে সেই ঐশ্বর্য্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অনুপমের একটী পুত্র আছেন, নাম শ্রীজীব। তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইহারা জানিতেন যে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে

যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে দুইজন চর পাঠান হইল। প্রভু যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তখন রূপ ও অনুপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা দুই ভাই প্রভুর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া আসিতে থাকুন। আরও লিখিলেন, তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা মুদিখানায় গচ্ছিত রহিল। এইরূপে পত্র লিখিয়া রূপ ও অনুপম তাঁহাদের বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, ছেড়া কান্থা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, বিনা সম্বলে, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। তখন এক চিন্তা,—এক কথা ভাবেন। যাঁহারা চিরদিন সুখে কাটাইয়াছেন, কখনও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিদ্রায় অনাহারে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন দুঃখ কি কষ্ট নাই। সঙ্গে কপর্দ্দকমাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহা দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক—কিরূপে প্রভুর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভুর কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধার হইবার আর উপায় নাই। প্রভুকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিয়াছেন। প্রয়াগে যাইয়া দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে ধূম দেখিলে অগ্নি নির্দ্দেশ করা যায়। সেইরূপ যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, তখন নিশ্চয় প্রভু সেখানে আছেন। শেষে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে। মধ্যাহ্নের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, দুই ভাই অতি দীনভাবে

দন্তে তৃণ ধরিয়া দীনের দীন হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে উঠিতে পড়িতে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, হে দীনদয়াময়! হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে?”

প্রভু রূপকে রজনীতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ নাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহাস্যে বলিতেছেন, “উঠ রূপ! দৈন্য সম্বরণ কর। কৃষ্ণের কৃপা অপার। তিনি তোমাদিগকে বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।” ইহাই বলিয়া আবেগভরে দুই ভাইকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত সমুদয় শুনিলেন। রূপ যখন বলিলেন যে সনাতন বন্দী আছেন, তখন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন, “না, তিনি আর বন্দী নাই, আমার এখানে আসিতেছেন।” প্রভু রূপকে পাইয়া কিছুকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিলেন, কারণ রূপের সহিত তাহার অনেক কার্য্য ছিল।

প্রভু ভুবনবন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট রামকেলী-গ্রামে গেলেন। আর রূপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গুণ দেখাইয়া ভুলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিলেন। কেন না, তাঁহার নিজের কার্য্যে উদ্ধার করে তাঁহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহ তখন ছিলেন না। সে কার্য্য কি?—না বৃন্দাবনের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ এবং পশ্চিমে পতিত জীবগণের উদ্ধার করা।

মনে ভাবুন বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার স্থান। শ্রীপ্রভু জীব-হৃদয়ে সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে

ধর্ম্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেইস্থান বিপক্ষগণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রভুর ভক্তের মধ্যে যাঁহারা বৃন্দাবন শাসন করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য পশ্চিমদেশে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার ও জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করা। আরও এক কার্য্য বলিতেছি। বৃন্দাবন ভারতে যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। কাজেই এই সেনাপতিকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন করুন না কেন, তাঁহাদের সকলকেই সেই গৌর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ দুরূহ কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহার প্রভুর শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই। এতদিন তাঁহাদের আর একটি প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তখন দেশে প্রবল এক বৈষ্ণবদল সৃষ্টি হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাউক," তাহা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবতারের ধর্ম্ম। ইহা নূতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানী-পণ্ডিতগণ আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটি নূতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নূতন সমাজ করিতে হইলে যেরূপ নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন?

তাই প্রভু স্বয়ং রূপ সনাতন দুই ভাইকে আনিতে রামকেলীতে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক ভাই সম্মুখে, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। সেখানে দুই ভাই

যাইয়া সে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রভুর লীলা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্য্য গোপনভাবে বাস করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিতেন, যেমন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, যেমন রূপসনাতন।

এই প্রয়াগে দুইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের একজন বল্লভ ভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, শ্রীধর-স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ভাগবতে টীকা করিয়াছেন। ইনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভ ভট্টকে অদ্যাপিও তাঁহার দলস্থগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বাড়ী প্রয়াগের নিকট আড্ডুলি বা আউলি গ্রামে। মহাপ্রভুর আগমনে প্রয়াগের নিকটস্থ দেশসমূহ তরঙ্গায়মান হয়। সুতরাং বল্লভ ভট্ট ভাবিলেন, এই গৌড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিয়া আসি। তাই প্রয়াগে আসিলেন, এবং শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতে গদ গদ হইলেন। তখন অনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনি বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বেশ জানেন যে, ভট্টের মনে গর্ব্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর জীবের প্রতি স্নেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব হয় না। প্রভু ভট্টের সহিত নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ী চলিলেন।

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে, সুতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেইবা প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া

উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি ? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভট্টের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট বহিরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় না। যথা চরিতামৃতে :—

"যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভু ধৈর্য্য মন। দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।"

শ্রীরূপগোস্বামী যখন প্রভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তখনই প্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছে ; কিন্তু একটু বাকী আছে। তখন ভাবিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য ! শ্রীকৃষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগীগণ সহস্র বৎসর যাপন করেন, অথচ কৃতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-কুমার, যাঁহাকে বালক বলিলেও হয়, তিনি কিনা প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। শ্রীমতী শাশুড়ী ননদীর নিকট আছেন। এমন সময় বংশীধ্বনি হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। মনে মনে বলিতেছেন, "বন্ধু, অসময় বাঁশী বাজাইয়া কেন আমাকে লজ্জা দাও ?" আর নানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী-ননদীর নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু "দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ।" প্রভু যত্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্য প্রেম কথা শুনে না।

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন—কৃষ্ণদাস প্রভৃতি, যাঁহারা বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সহিত আসিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভু আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি গোসাঞিকে



আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন, আর উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাকে আনিয়াছি, সেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় সেখান হইতে তাঁহাকে আনিও।” ভট্ট নিমন্ত্রিতগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকা করিয়া প্রয়াগে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু সে পরের কথা।

ভট্টের ওখানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যায় আগমন করিলেন। ইনি ত্রিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহার কৃত কবিতা পদ্য-বলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার লুকাইতে যাওয়া বিফল চেষ্টা, তথাপি একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে আছে। তৎপরে প্রভু বারাণসী চলিলেন। রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন “তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না।” ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল না হইয়া রুক্ষভাবে বলিলেন, “সে কি? আমার আজ্ঞা পালন কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধনার চেষ্টা কর, আপনার সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়া বৃন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত নীলাচলে দেখা করিও।” ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া চলিলেন. আর—

“মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ রহিল পড়িয়া॥”—চরিতামৃতে।

এখানে শ্রীরূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অনুপম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দেখেন যে সেখানে সুবুদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ

গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। সুবুদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতসাহ ছিলেন। রূপ হোসেন সাহর চাকুরী করিতেন, আবার হোসেন সাহ তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ সুবুদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর কৃপায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে, আর সুবুদ্ধি রায়ও প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে। হোসেন সাহ যখন গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তখন তিনি দির্ঘী খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মারেন, আর তাহার দাগ অঙ্গে রহিয়া যায়।

কিছুকাল পরে এই হোসেন সুবুদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধিকে, পূর্ব্বে প্রতিপালক ভাবিয়া, বধ না করিয়া, বরং অতি আদরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাবুকের দাগ ইহা সুবুদ্ধি রায় কর্তৃক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামীকে বাধ্য করিয়া, সুবুদ্ধির মুখের মধ্যে জোর করিয়া জল ঢালিয়া দেওয়াইল। এই জন্য সুবুদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্তঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য সুবুদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় প্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে সেখানে উপস্থিত হন। সুবুদ্ধি, প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" সুবুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই, প্রভুর কৃপায় গৌড়ের বাদসাহ ও মন্ত্রী উভয়ে এই সময় এক সঙ্গে বৃন্দাবনে মিলিত হইলেন।

এদিকে প্রভুও প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী আসিলেন। পথে দেখেন চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, প্রভু আসিতেছেন, তাই তাঁহার অপেক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন ; তপন মিশ্রের বাড়ী ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার দুই এক দিন পরেই একদিন সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "দ্বারে যে বৈষ্ণব বসিয়া আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে যাইয়া বলিলেন, "কৈ, দ্বারে কোন বৈষ্ণব তো দেখিলাম না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে না ?" তাহাতে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম।" তখন প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশই সনাতন।

ইনি কারাগারে তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া, কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি সপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভৃত্যের সহিত গঙ্গা পার হইলেন। পার হইয়াই বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। সম্বল মাত্র নাই, পরিধানে একবস্ত্র। তবে আহার কি আরামের ভাবনা তখন তাঁহার নাই,—কিরূপে প্রভুর নিকটে যাইবেন ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। দিবানিশি চলিয়া পাতড়া পর্ব্বতে আসিলেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্ব্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা সনাতন জানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিয়া ভূমিককে সপ্ত মোহর দিলেন, আর একটি ঈশানকে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ঈশান বাড়ী ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বহুগণ এখনও বর্ত্তমান। প্রভুকে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল দুই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাই এত তেজস্কর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিয়া হাজিপুরে আসিলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম জপিতেছেন। এ জগতে কে কার তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, আর আমি তাঁহার। তিনি ছাড়া আর কে-জানে যে সেখানে সনাতনের ন্যায় জীব বিরাজ করিতেছেন? এমন সময় সনাতনের ধর্ম্ম-ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত সেই হাজিপুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত ঘোড়া কিনিতে আসেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া আরাম করিতেছিলেন, এমন সময় যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া সনাতনের স্বরের মত বোধ হইল। তখন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টুঙ্গি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া দেখেন সনাতনই বটে, তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধানে, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর বদনে উদাস ও বৈরাগ্যভাব। ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক হইলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "একি, এই বেশে তুমি এখানে?" তিনি গৌড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, "বাড়ী চল।" সনাতন বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুঠা স্থান পাইবে

কেন ? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বুঝিলেন,. সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন সনাতন লইলেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন, পরে একখানা ভোটকম্বল দিলেন। নিতান্ত অনুরোধ ও শ্রীকান্তের দুঃখ হইবে ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইয়া আবার অনন্ত পথে চলিলেন। শ্রীকান্ত দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

শচী মাতার একটী গীতের কিয়দংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা—

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে,
আমার সোণার বরণ গৌর-হরি জনেক সন্ন্যাসী সাথে। ধ্রু।
তাহার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢলে পড়ে যায়, যেন পাগলের প্রায়,
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে॥"

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস করিতে করিতে যাইতেছিলেন ? যথা—"তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে দেখিয়াছ ? তাঁহার কচি বয়স, বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়। তিনি প্রেমে উন্মত্ত, তাই ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, গাত্রে ছেঁড়া কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেকৃষ্ণ নাম।" না,— সনাতন কিছুই করেন নাই। তিনি একমনে গিয়াছিলেন। কাহারও নিকট এক বারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে, সূর্য্য উদয় হইলে লোক আপনি জানিতে পায়। প্রভু যেখানে আছেন, সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে, সেখানে

লোকে তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ ঝড় হয়, তাহার নিদর্শন বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। প্রভু যেখানে উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবস্থিতি বহুদূর হইতেও তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার দুধারে তাঁহার গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান। প্রভু যখন যে দিকে যাইতেছেন, বা যে দিকে আসিতেছেন, এই সংবাদ তাঁহার বহু অগ্রে চলিয়া যায়।

সনাতন যেইমাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই জানিতে পারিলেন যে প্রভু ওই নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নম্বর তল্লাস করিতে হইল? তাহা নয়। প্রভু কোথা আছেন, না চন্দ্রশেখরের বাড়ী। চন্দ্রশেখরের বাড়ী কোথা? না, যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিতেছে। সনাতন এই সংবাদে অতিশয় আশ্বাসিত ও পুলকিত হইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে যাইয়া বসিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, দ্বারে সনাতন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রায় দুই মাস হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সনাতন প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্বাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপ, তাহাতে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে কৃপা করিবেন? তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন আপনাকে ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার যে হৃদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্রকৃত। তাই প্রভুর নিকট

যাইতে ভয় হইতেছে। অনুতাপ কাল্পনিক হইলে সে অনুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

ওদিকে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানিতে পারিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন; তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ, শীর্ণ অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্যায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল একজন দরবেশ বসিয়া আছেন। প্রভু বলিলেন, "তাঁহাকেই লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর তো অবাক। যাহারা দরবেশ তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড় শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদায় ক্রিয়া আছে, তাহা অনুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পান না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন, ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট "আপনি" হইয়াছেন।

তখন হর্ষে, আশায়, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনের অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু হয়তো আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হাঁ, আপনাকেই ডাকিতেছেন।" তবু সনাতনের সন্দেহ গেল না। তিনি ভাবিতেছেন,—প্রভু তাঁহাকে চকিতের ন্যায় একবার দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ ভুবনপাবন ভক্ত প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃশ্য পামর; প্রভুর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই বা এমন নরাধমকে তিনি ডাকিবেন কেন? তাই চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর আপনার

ভুল হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া ভিতরে গমন করুন, আর ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে কাহাকে ডাকিতেছেন।" সনাতন আবার বলিতেছেন যে, তিনি যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তো প্রভুর নিকট তিনি পাঠান নাই? এই সমুদায় আলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন, আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব আপনি চলুন। তখন সনাতন (যথা ভক্তমালে)—

দুই গোচ্ছা তৃণ করে, এক গোচ্ছা দন্তে ধরে পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।
দুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডি-জন পারা, অপরাধি আপনা মানয়॥
"তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি, সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ, তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি।
নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি, নীচকর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্লভ জন্ম পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম, কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু, করুণা-কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি, এ অধম জনারে বিচার॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্ত-বিষাদ, ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়, কহে "মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছাড়া নাহি কভু, ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥"
প্রভু কহে, "সনাতন, দৈন্ত কর সম্বরণ, তোর দৈন্তে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, হইল যে তোমার সম্মুখ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি, উদ্ধারিলা বিষয় কূপ হতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহো তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥"

প্রভু পূর্ব্বে রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিবার জন্য কাশীতে রহিলেন। দুই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহাদের

দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুর দুই মাস লাগিয়াছিল। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত্ত্ব বিবৃত আছে।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাইবার জন্য কাশী ত্যাগ করেন, তখন প্রকাশানন্দ বড় খুসি হইলেন এবং তখন যেখানে-সেখানে যখন-তখন বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী, আপনার ধর্ম্ম জানে না, বেদবেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত করে, ভাবকালি দ্বারা ইতর লোককে ভুলায়। আবার মহা-ঐন্দ্রজালিক, নানারূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড় বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাকি তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি, তাহাকে নাকি যে দেখে সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকালি কাশীনগরীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ যখনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন তখনই উল্লখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দা করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভয়ে চৈতন্য আমাদের নিকট আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।" কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল আরম্ভ হইল, তখন প্রকাশানন্দের পূর্ব্বকার কথা রহিল না। তখন সে কথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য আবার আসিয়াছে? তা আসুক, দেখিও সে দূরে দূরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও আসিবে না। তবে তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড় শক্তি, সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রচণ্ড লোককে যে ভুলায় সে তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস তাহাতে তিনি বৈষ্ণবগণের মতে এক প্রকার নাস্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্ম্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্ম্মে সম্প্রীতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া যে প্রভুকে কখন দেখে নাই সে প্রভু দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু যে একবার চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা হউক, প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্জ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন।

এদিকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণাধিক ভালবাসেন, সুতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের দুঃখ প্রভুর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভু শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্য করিতেন, কিছু বলিতেন না। তখন ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ একপ্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাহ্মণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুর গুণানুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ সরল চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে তিনি কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার দুর্ম্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না।

ইহার উপায় কি ? তখন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ করিলেন। ভাবিলেন যে কাশীর সমুদায় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শ সাব্যস্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশ সহস্র সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। তাহার পর, সকলে ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন করিয়া নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু আমরা জানি সন্ন্যাসী-সমাজে আপনি গমন করেন না; কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।" প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই এ সমুদয় ষড়যন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি।" তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, "চৈতন্য" নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশ সহস্র নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ বড় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈতন্য", যাঁহাকে তিনি প্রকাশ্যে বহুবার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সর্ব্ববলে বলীয়ান সেখানে—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিতেছেন! ইহার উদ্দেশ্য কি? সার্ব্বভৌমের ন্যায় তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি?

সময় মত সন্ন্যাসিগণ সভায় আসিলেন এবং প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিবেন, যাঁহাকে লোকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করে সে সন্ন্যাসী না জানি কেমন! এমন সময় প্রভু,

সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে-ধীরে নাম জপিতে-জপিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমি আমার "প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

প্রভু আসিলে সন্ন্যাসী-সভায়, "ঐ চৈতন্য আসিতেছেন" বলিয়া একটি ধ্বনি হইল। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটী যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত বদনে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট ও কমল নয়ন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ ভাবে ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভু অগ্রে আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেইখানেই বসিলেন।

সন্ন্যাসিগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁহার বয়ক্রঃম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরূপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয় মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যতঃ তিনি করিতে দিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগই থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তখন বেশ বুঝিয়াছেন। আবার প্রভুর বদন দর্শনেও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ, প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আসুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ, আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভারতী নীচু। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহানুভব সরস্বতীর তখন শক্রতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও সুন্দর মুখ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য! কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদয় মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ন বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদপাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দুষণীয় কার্য্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন তাহা কৃপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছে। আবার, প্রভুর নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য, আপনি যে পূর্ব্বে প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ও কতক কৌতুহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কি উত্তর করেন ইহা শুনিবার নিমিত্ত সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্যের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা ছলনা করিয়া মনুষ্যসমাজে বেড়াইতেছেন।

সরস্বতী যেরূপ বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরুবুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি

দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' ॥'

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কণ্ঠস্বর সঙ্গীত হইতেও মধুর। তিনি যখন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। সে ব্যাখ্যা অদ্ভুত। এই ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে যে এরূপ অর্থ আছে তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই ; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না ; ইহাতে তোমার কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্ল্লভ ধন 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহাও লভ্য হইবে'।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক-সন্ন্যাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। জপিতে জপিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। তখন আমি কখন হাসিতে, কখন কান্দিতে, কখন নাচিতে, কখন বা গাহিতে লাগিলাম, তখন ভাবিলাম, আমার একি দশা হইল? এ ত উন্মাদের

অবস্থা! তবে কি সত্যই আমি পাগল হইলাম? এইরূপ ভাবিয়া, ভীত হইয়া, আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম, এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, "প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন? ইহার এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্ণনাম জপিতেছিলাম। জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল। এখন নাম জপিতে জপিতে আমি হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই, এমন কি, নাম জপিয়া আমি পাগলের মত হইয়াছি। এখন ইহা হইতে কি করিয়া উদ্ধার হইব, তাহা কৃপা করিয়া বলিয়া দিন।"

আমার এই কথা শুনিয়া গুরুদেব হাস্য করিয়া বলিলেন, "এ তোমার বিপদ নয়,—সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কৃষ্ণনামের শক্তিই এইরূপ। উহাতে হৃদয় ঐরূপ চঞ্চল করে,—কৃষ্ণের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর হইতে পারে না, তাহাই অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তুমি লাভ করিয়াছ।" ইহাই বলিয়া গুরুদেব আমাকে কয়েকটী শ্লোক শুনাইলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

অর্থাৎ—"এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিতচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার প্রিয় কৃষ্ণনাম লইয়া হাস্য রোদন হুঙ্কার গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

অর্থাৎ—"যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের সুফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় বা শ্রদ্ধায়

গান করে, তাহা হইলে হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনোঽকৃচ্ছং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং॥"

অর্থাৎ—"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত-সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছলভ্য চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদন্তর গুরুদেব বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম।" গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞা দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন হাস্য প্রভৃতি করি, তাহাতে আমার হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।" শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দৈন্যের শক্তিতে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীদিগের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমে দিলেন। প্রথম বেদ পাঠ কর না কেন? দ্বিতীয় নৃত্য গীত কর কেন? তৃতীয় সন্ন্যাসী-দিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, বেদান্ত না পড়িলেও চলে, হরিনামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদান্ত পড়িলে, কোন ফল হয় নাই। বিশেষতঃ কলিকালে, হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই—নাই—নাই। আর নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি যে নৃত্য গীত করেন, সে আপনার ইচ্ছায় নহে। নাম করিতে করিতে, তাঁহার শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, আর তখন নৃত্য গীত আপনিই আসে। সন্ন্যাসী-দিগের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার কোন কারণ দেখাইলেন না।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভু কর্ত্তৃক কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন,—"এ যুবক একটি সুন্দর বস্তু, ইহার কথা অতি মিষ্ট, এ অতি সুবোধ, তবে একটু চঞ্চল। যদি আমার কাছে কিছু দিন থাকে, তবে এই কৃষ্ণচৈতন্য একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে। ইহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে, ইহা ভাল, তবে বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, অবশ্য দোষের কথা।" প্রকাশানন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন,—"এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম লও, ইহাতে সকলেরই সন্তোষ, আর কৃষ্ণপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেদান্তের উপর অশ্রদ্ধা কেন?" প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে অপরাধ হইবে। আবার উত্তর দিলে, তাহা যদি আপনাদের তৃপ্তিকর না হয়, তাহা হইলেও আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি সরলভাবে বলিতেছি, কেন আমি বেদান্ত পড়ি না।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব, ইহা হইতেই পারে না। আপনার মুখে সুধা ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরী-পূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ সম্ভবে না। বেদান্তসূত্রের যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য

নহে। সূত্রের যে অর্থ তাহা পরিষ্কার লেখা আছে। সুতরাং সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন কি? ব্যাখ্যার তখনি প্রয়োজন, যখন সূত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি, সূত্রের অর্থ বেশ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কষ্টকর। আপনারা দেখিবেন সূত্রের অর্থ একরূপ, কিন্তু শঙ্কর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহার অর্থ অন্যপ্রকার করিয়াছেন। ফলকথা, সূত্র যে সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু শঙ্কর যে ভাবে তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃকল্পিত,—সূত্রের অর্থের সহিত তাহা মিলে না।"

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন; —শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। কারণ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্‌গুরু বলিয়া মান্য করেন, সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করায়, তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্য। তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্য করেন। আপনি যে তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার কথা!"

প্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য যে জগতের গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা। এ সূত্রের যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাক্য। কিন্তু শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছে উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন করা ও তাঁহার ভাষ্য মনঃকল্পিত।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাসীরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ

বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রবণ করিয়া শ্রীচরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা প্রভুর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন আর গুরু যেরূপ বুঝাইতেন সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাদের চক্ষু ফুটিল, তখন পরস্পরে এইভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণচৈতন্য শুধু যে পরমসুন্দর ও পরমভক্ত তাহা নহেন,—পরম পণ্ডিতও বটেন! প্রকাশানন্দের অভিমানই ছিল যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। এই পাণ্ডিত্যাভিমানই তাঁহার যত অনর্থের মূল। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহং ধর্ম্ম মানেন। তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী সুতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত চালাইবার জন্য, সূত্রের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। স্বীয় মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে সূত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছে। তাই তিনি আপন মনের মত সূত্রের অর্থ করিয়াছেন! সাধারণ লোকে সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন। প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, তাহাব টীকার আবশ্যক করে না। সেই সরল অর্থের সঙ্গে শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি ন্যায্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরমপণ্ডিত তাহাও জানিলাম। আপনি যে শঙ্করের মত খণ্ডন করিলেন, ইহা আপনার অসীম শক্তির পরিচয় সন্দেহ নাই। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন, আর তাহার মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অর্থ করিলেন যে, শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরমপুরুষার্থ। অর্থাৎ বেদ বৈষ্ণবধর্ম্মকে পোষকতা করিতেছে। অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দুষিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট ভাষ্যের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক-সন্ন্যাসী নহেন, বয়সে বালক হইলেও ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বড়।

প্রকাশানন্দের তখন একপ্রকার পুনর্জ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। কারণ কৃষ্ণচৈতন্য জগতে অনেকের নিকট তাঁহার অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য কেবল পরমভক্ত, পরমপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রকারে পরমসুন্দর নহেন, তাঁহার প্রকৃতিও বড় মধুর। আরও দেখিলেন, ভক্তি বস্তুটি অতি সুস্বাদু। আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালকের নিকট তিনি শিখিলেন। এই সকল কারণে, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে, তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটিকে অন্যায়

করিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ মহাশয়-ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আমি আপনাকে বরাবর নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ, আমি তখন দম্ভে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম এবং দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। আর ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম। অদ্য আপনার শ্রীমুখে উহা যে কি তাহা শুনিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই সত্য, সর্ব্বজীবের প্রাণ। তাঁহার শ্রীচরণ সেবাই জীবের পরমধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন!" তখন সন্ন্যাসীগণ ভক্তিতে গদগদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তি সম্বন্ধে উপরিউক্ত সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহোদয়গণ! প্রভু 'হরিনাম' শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন, তাহা অনুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই,—"এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই। 'হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা অর্চ্চনা,—ইহার কিছুতেই গতি হইবে না। কেবল হরিনামে হইবে। অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই,—দেবদেবী পূজা পর্য্যন্ত বিফল।"

পরে সন্ন্যাসীরা ভোজনে বসিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তখন

সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে অমৃত বর্ষণ হইল, এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এতদিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। এখন সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না। তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অদ্বৈত-মত স্থাপন করা। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপন মনের মত সূত্রের বিকৃত-অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় হয় বলিতাম, কিন্তু মনে প্রতীত হইত না। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সরল অর্থ শুনিয়া অমনি তাহা হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সারতত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি। আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ বাকবিতণ্ডা হওয়ায়, সমগ্র কাশীনগরীতে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ নবীন গৌড়ীয়-সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রাদায়ের নেতৃগণ, এবং অন্যান্য সাধু ও পণ্ডিতগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুর নিকট আসিয়া,—কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত বারাণসীতে কৃষ্ণনামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও

নাম-সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, এবং লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রভুর সঙ্গে প্রকাশনন্দের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মনও নম্রীভূত হইল। বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী যদি প্রেমে আবদ্ধ হন, তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়েন। যিনি শিক্ষাদ্বারা হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল নির্গত হইতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সহৃদয় লোক। তিনি রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম-উৎকর্ষই তাঁহার প্রকৃতির অনুমোদনীয়। দৈববশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। যেমন বাঁধ দ্বারা নদীর স্রোত বদ্ধ করা হয়, তিনি সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্প ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তাঁহার হৃদয় যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—আর্দ্র হইল। শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় তিনি এক অভিনব অতি সুস্বাদু আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে ভক্তি করা কেবল বেদের উপদেশ নহে, মানবের পরম-পুরুষার্থ বটে। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল। সেই চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজকৃত শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্ যথা:—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযুষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষেৎ কিমপিকরুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্জনেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গ যষ্টি
শ্চেতঃ কস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তশ্চকার॥

অন্বার্থ—"যাঁহার অঙ্গযষ্টি কনককদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং যিনি

করুণরসসিক্ত অঞ্জনপূর্ণ নেত্রদ্বারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ সুধাসিন্ধু কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনইবা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিন্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন।"

সরস্বতী-ঠাকুর ভক্তি হইতে উত্থিত অভিনব সুখ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন —তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এমন আনন্দ তাহাকে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্ন্যাসী! ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার যে ঋণ তাহা শুধিবার নহে।

যাঁহারা মহাসন্ন্যাসী কি মহানাস্তিক, তাঁহারাও ভক্তিরূপ সুধা আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ একটি সাধুর কথা আমি শ্রীঅমিয়-নিমাইচরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভজন করিতেন। কিন্তু যেই একটি পূর্ব্ব-রাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সরস্বতীর হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটি রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এই যে সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীন পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহার চরণপ্রান্তে ধাবিত হইতেছে কেন? এ বস্তুটি কে? এটি কি মনুষ্য, না কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা?

এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব, ইহাকেই বলে রতি, ইহাই প্রেমের বীজ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

কোন রমনী, কোন পুরুষকে দেখিয়া, তাঁহাকে চিত্ত অর্পন করেন। সেই রমণীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটি অনির্ব্বচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হন। সেই রমণী তাঁহার নিমিত্ত জাতিকুল সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সেইরূপ প্রেমোদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার দেহদ্বারা জীবকে সেই সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণে রতি হইল। তাহার পরে কানাই-নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহের চিত্রপটদর্শনে, কি স্বপ্নে, প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎদর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। নিজে বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না, কেবল তাঁহাকেই ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন তিনি কে? কখনও আপনার উপর, কখনও তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে ভাবিতেছেন, কেন তিনি আমার মাথা খাইতেছেন? আমি এখন কি করিব? তাঁহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া তো থাকিতে পারিতেছি না! কিন্তু যাইতে যে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন হইতে প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা উপরে বলিয়াছি। তিনি যখন স্নান করিতে যাইতেন তখন পথের দুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত, ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। সরস্বতীর সহিত মিলনের পরে প্রভু মোটে ৪।৫ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এই সকল ঘটনা এই কয়দিনের মধ্যে হয়। প্রভু

প্রত্যহ স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিয়া এবং আপনার অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন।

এই মিলনের দুই তিন দিন পরে প্রভু একদিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব হরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় সে দিনও চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সে দিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত হইলেন এবং হাতে তালি দিয়া এই পদ গাহিতে লাগিলেন, যথা:—
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥"
প্রভুকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে চলিত ও কলরব করিত। সেদিন প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া তাহাদের কলরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

অদ্যকার এই যে কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মত কম্বিত হইতেছিল। তথাকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম্ম। তাই, তাঁহারা সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তির নামমাত্র শুনিয়াছেন কিন্তু সে যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা জানেন না। একটি ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, আর হইলেও তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে; ইহা প্রভু জানিতেন। আর তাঁহার কৃপায় তাঁহার ভক্তগণও বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্ব্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই। কিন্তু তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে। আর তাঁহার দূরদর্শনে ও হাব ভাব কটাক্ষে এবং তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটি জনরব

উঠিয়াছে যে, একটি অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, ইনি বড় মহাজন, কেহ বা বলিলেন, ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভুর লীলায় এই একটী অদ্ভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয় যে, তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই লোকের মনে হইত যে, হয় শ্রীভগবান আসিয়াছেন, কি আসিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিল। দক্ষিণ-দেশে যখন যেখানে গিয়াছেন, তখনই সেখানে লোকের মনে ভাব হইয়াছে ঐরূপ। যখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে। বারাণসীতে লোকের মনের ভাব হয়েছিল যে, কি একটা বৃহৎ বস্তু হইবে তাহার উৎযোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসী-সভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আসিলেন, তখন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল।

এইরূপ যখন সকলের মনের ভাব,—যখন কাশীবাসীগণের মন কম্পিত ও দ্রবীভূত হইল, তখন ভক্তিবীজ রোপণ করার সমস্যা হইল, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর অমনি তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ এবং ক্রমে লক্ষ লক্ষ দশক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভাসিয়া চলিলেন!

তখন,—শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, এই কথা মুখে মুখে সহরময় প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর সহস্র সহস্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল, এবং উহাতে অত্যন্ত কলরব হইল। প্রকাশানন্দ যে সময় বাসায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য বস্তুটি কি, তখন এই কলরব তিনি

শুনিতে পাইলেন। আর ঠিক সেই সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সভায় সংবাদ দিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাই দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক হরিধ্বনি করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রকাশানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দেখিতে ধাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াছেন, তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব, কি তাঁহার নৃত্য কখনও দেখেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছেন, আজ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বিদ্যোত্তম, জ্ঞানময়, কৌপীনধারী সন্ন্যাসীঠাকুর ধৈর্য্যহারা হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিয়া দিয়া, বালকের মত সন্ন্যাসীদিগের ঘৃণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড়িলেন।

এখন আসল কথা শুনুন। সরস্বতী তখন ভিতর-বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকট যান, তাঁহার কাছে বসেন, তাঁহার সুধামাখা মধুর মধুর কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উকি মারিয়া তাঁহার চন্দ্রবদনখানি দেখিয়া আসেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই সে সুযোগ উপস্থিত হইতেছে না। কারণ প্রভু আসেন না, আর তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তিনি একরূপ কাশীর রাজা, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী। তিনি চঞ্চল বালকের ন্যায় বালক-চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন ইহা কি করিয়া হয়। দারুণ কুলের দায়, তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী সুযোগ পাইলেন; অমনি প্রিয়তমকে দেখিতে ছুটিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদগণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ

দেখিলেন, তখন তাঁহার নিজকৃত শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

> উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
> বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্
> বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
> র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥১০।

অর্থাৎ—যিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি সুবর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরিহরি এই আনন্দজনক ধ্বনি দ্বারা জগতে অশুভ ধ্বংশ করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ শ্রীচৈন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।”

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্তলি ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ন্যায় ধারা ছুটিতেছে এবং সেই নয়নের জল দ্বারা চতুস্পার্শ্বস্থ সমস্ত লোকের অঙ্গ বিধৌত হইতেছে। সরস্বতী সম্মুখে এক অপরূপ অনির্ব্বচনীয় ছবি দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, যেন মূর্চ্ছিত হয়েন। পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অনুভব করিলেন। এইরূপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া, প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞলোকের পক্ষে নয়নজল নিক্ষেপ করা বড় লজ্জার কথা। সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই! সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে সরস্বতী

রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু তিনি দুর্ব্বার নয়নধারা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল ও উহা মুখ বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। তখন দেখিতেছেন যেন একটি তেজোমণ্ডিত সুবর্ণের পুতলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি, কিম্বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন, স্বয়ং শ্রীহরি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, শ্রীহরি কপটসন্ন্যাসী-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার নিজ কৃত আর একটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটী প্রহসনম্।
বমন্তঃ মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্॥ ১২॥

অন্বয়ার্থ—"যিনি কোটী নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা কোটী বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাইতেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটী অমৃতসিন্ধু উদ্গার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপটসন্ন্যাসী শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে! দেখিতেছেন, জগৎ একেবারে সুখময়, এখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে

গমন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে! গৌরাঙ্গের রূপ চুমুকে চুমুকে পান করিতেছেন, আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন। নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে প্রভুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তখন তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু যেরূপ নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারও পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ যেরূপ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহার অঙ্গও সেইরূপ হইতে লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি রচনা করিয়াছিলাম, যথা—

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ, নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে, অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া॥
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি, গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে।
কঠিন হইয়া ছিনু, নিবারিতে না পারিনু, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥
হাম চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেমজ্বালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে।
গৌরবর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥
নিরমল কুলখানি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে।
বলরাম বলে শুন, সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতে॥

প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই! প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি

নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, "হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোকশিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম!"

প্রভু যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভু স্বয়ং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবান! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে "স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ। ভেজেসর্পব পুহিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥" পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে, ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করায়, আমারও অপরাধ, আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।"

সরস্বতী বলিলেন, "আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান। কিন্তু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন তবুও আমি পাষণ্ড, আর আপনি ভক্ত, কাজেই আমার পূজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা সাধারণের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন, এবং উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধীরে আপন বাসায় গমন করিলেন।

জীবকে দুই রূপে বিভক্ত করা যায়,—যাঁহারা পরকাল মানেন, আর যাঁহারা মুখে বলেন যে, পরকাল মানেন না। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটী রসের, কি উহার একটির কি কয়েকটির, আশ্রয় করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত কাহারা? না যাঁহাদের হৃদয়ে কোন উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানারূপ সাধনাদ্বারা আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের,—অপর কাহারও বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনা মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম, সেগুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাতে যদিও তাঁহারা বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত-রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, মায়াবাদী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—"শ্রীভগবান যে, আমিও সে।" শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না। আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করিব। কাজেই ইঁহারা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্তিকে ততটা শ্রদ্ধা করেন না।

যাঁহারা দাস্য-রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক কি বিষয়-ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন যথা—"হে আমার সৃষ্টি ও পালন-কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনাই তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্য রস দ্বারা হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ভজনা করিয়া থাকেন। দাস্য-রস ও ভগবদ্ভক্তি এক-জাতীয় বস্তু। যাঁহারা দেবীকে 'মা' বলিয়া ও শঙ্করকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভজন দাস্যভক্তির অনুগত দাস্যের পরে আর তিনটি রস, অর্থাৎ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই তিনটি রস ভগবদ্ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয়-জ্ঞান ব্যতীত, তাঁহাকে সখা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্যময়,—এই জ্ঞান থাকিলে তাঁহার সহিত এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। কেবল বৈষ্ণবগণ এই তিনটি রস দ্বারা ভজন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত এই রস অন্য কোন ধর্ম্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণ-নাথ ভাবে ভজনা করা মনুষ্যের অসাধ্য। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন মাত্র; তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য; এবং বৈষ্ণবগণও তাহা স্বীকার করেন। সেইজন্য তাঁহারা গোপী-অনুগত হইয়াই এ সমুদায় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরূপে? না—বৈষ্ণব স্বয়ং শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না,—তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বারা

সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন না,—শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অনুগত শ্রীবৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে নিবেদন করেন শ্রবণ করুন,—

বধু! কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি॥
গুরু-গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে, দুকুলে হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর, রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে, সদা অন্তরেতে থাক॥

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন করা হইল, ইহা চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে। কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কেহ এরূপ সম্বোধন করেন, তবে তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার দ্বারা শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করাইতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসায় আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, দুই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েকদিনের মধ্যে ভজন পথের এক-সীমা হইতে অন্য-সীমায় আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজস্কর স্বাধীন-পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেমভিখারিণী অবলা। সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সমুদায় ভাব-তরঙ্গের খেলা

খেলিয়াছিল, তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে অতি জীবন্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন যে, তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলামাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। ফল কথা, পাপ দুই প্রকারে ধ্বংস করা যায়,—এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া ; আর ভগবৎপ্রেমে ও ভক্তি দ্বারা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবর্ত্তিত করিয়া অর্থাৎ তাঁহার পাপরূপ যে অঙ্গার, তাহাতে একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা উহার মলিনত্ব ঘুচাইয়া ; এইরূপে অন্তরের কুপ্রবৃত্তিগুলি ভক্তি কর্ত্তৃক শোধিত হইলে উহা সুন্দর আকার ধরে। তখন সেই সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেন্টা, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা-উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। আর যাঁহারা অনুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

> ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
> দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্কাপি নোসন্।
> যন্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
> ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত

স্থানে গমন করে নাই,—সে ব্যক্তিও যদ্দস্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, (যথা ৭৮ শ্লোকে)—"অতি পাতকী, নীচজাতি দুরাত্মা, দুষ্কর্ম্মশালী, চণ্ডাল, সতত দুর্ব্বাসনারত, কুস্থানজাত, কুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্টব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌর হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অকস্মাৎ সহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে যাহাদিগকে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছুমাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নিরত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ-শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে হয় নাই।"

সরস্বতী বলিলেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীকৃত হইতেছে ? যথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা দুরস্থৈরপ্যানতোবাদৃতোবা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্‌ ॥

অর্থাৎ—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ত্তিত অথবা রূপ-লাবণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে, কিম্বা দুরস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্ম্মল হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে

স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্ম্মল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যে,—না। যেহেতু তখন তাঁহার ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সমুদায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জ্বালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনাআপনি তাহা বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদয় হইবামাত্র প্রথমেই যেরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—"সখি! বন্ধুয়া পরশমণি। ধ্রু। সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ খানি॥" অতএব পাপ মোচনের নিকৃষ্ট উপায় আত্মগ্লানি, উৎকৃষ্ট উপায় শ্রীভগবানের নাম কি গুণ-সুধারসে হৃদয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী-ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর-দর্শনে, অতি যে মহাপাপী সেও নির্ম্মল হইত এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগূঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরূপ শক্তি কোন জীব, কি কোন অবতার, কখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পূজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে,—না যাহার উপর ঘৃণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপরে ঘৃণা হইয়াছে। তাঁহার এখনকার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥৩২॥

অর্থাৎ—"আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ত্ব-জ্ঞান প্রফুল্লবদনবিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে ধিক্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলকে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট-তপস্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমী-গণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশুগণ শোচনীয়, যেহেতু ইহাদিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরপদাম্ভোজের মধু লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় নাই।"

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি "নরপশু" বলিতেছেন। অর্থাৎ উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে পূর্ব্বে তিনি নিজেই নরপশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য নস্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্ ॥

অর্থাৎ—"বৈরাগ্য-কোটীতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্র্যাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি-কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা-কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভক্তি-কোটিতেই বা কি হইবে—শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের চরণনখ-জ্যোতি দ্বারা হর্ষপ্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ গুণসমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্যেতে নাই।"

যাঁহারা নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোতিস্বরূপ ভাবিয়া যোগসাধন

করেন, তাঁহাদের ফল—'ব্রহ্মানন্দ'। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন, তাঁহাদের ফল—'প্রেমানন্দ'। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া স্বরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে যে হর্ষ আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটী অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতীঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোক) অবতার-শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে যোগশিক্ষা দেন। কিন্তু ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহৎকার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যনাশ। যোগ-শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেমধন যিনি দান করিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজজন করিলেন। এই সকল জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, দৈত্যের কি অন্য কাহারও ভয় নাই। অর্থাৎ যাহারা ভগবৎপ্রেম পাইয়া শ্রীভগবানের নিজজন হইল, সুতরাং তাহাদের আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন। যেহেতু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপীও মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্য জীব ইহা হইতেই পারে না, তিনি অবশ্যই সেই শ্রীভগবান। কখন স্বরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, নির্ব্বোধ, কি মুগ্ধ। কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্খ কি নির্ব্বোধ নহেন? সার্ব্বভৌম যখন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কপটবেশধারী শ্রীহরি,—সামান্য জীব নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীব কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর,—যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়! এখানে আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ যোগ সাধন করা তোমার আমার সাধ্যাতীত। কাজেই সেখানে প্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে? তাঁহার পদে অবনত হইলে যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর ন্যায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমনি, তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলেন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিতে পারি না?

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করি নাই, কি তাঁহার সহিত সহবাস ও ইষ্টগোষ্ঠী করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। কাজেই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি বিচারে অবশ্য লাভ আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী সরস্বতী, তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতী বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় হেমদণ্ডের ন্যায়"; তাঁহার "হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্তভাগ মধুর-মধুর হাস্যসমন্বিত"; তাঁহার "শ্রীমুখ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্যশোভিত"; তাঁহার "স্নিগ্ধ-দৃষ্টি"; তাঁহার "করুণাসিন্ধু অশ্রুনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়নপদ্ম হইতে নিঃসৃত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅঙ্গ"; তাঁহার "মুখসৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তিধারী"; তাঁহার "জপমালা-শোভিত প্রেমে-কম্পিত কর" তাঁহার "শ্রীমূর্ত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটি-অমৃত-সমুদ্রকে উদ্গার করিতেছেন।"

এখন প্রভুর ভাব, সরস্বতী কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি "করতলে বদরফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়নবারিধারায় পৃথ্বীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; যিনি "নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মুক্ত হয়েন," "ময়ূর চন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন," "গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত কলেবর হয়েন"; যিনি "শ্যামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে যেমন মনে এক একটি ভাবের উদয় হইত, স্বরস্বতী অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন একদিন বা প্রভুর রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইয়া এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক :—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেহম্ভোধিকোটি র্মধুরিমনি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥

"যিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় পরমসুন্দর, কোটিচন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদজনক, কোটিমাতৃসদৃশ স্নেহবান, কোটিকল্পবৃক্ষসদৃশ দাতা,-সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি-কোটি বিচিত্র প্রণয়রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন।" বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না। তাই লিখিলেন—"মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি। এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতীঠাকুর প্রভুর রূপ গুণ বর্ণমা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না কুলাইতে পারিয়া—"কোটি" "কোটি" "কোটি" বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

সরস্বতীর তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, তখন আর

তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি হইয়াছে,—এমন কি কাশীনগরীতে বাস পর্য্যন্ত। আবার যে সমস্ত সঙ্গী ও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আসিলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আসিলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসী বা কেহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করিতেন। এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। তবে এখন কি করিতেছেন, তাঁহার গ্রন্থেই তাঁহার হৃদয়-তরঙ্গের পরিস্ফুট বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি,—না, একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তখন আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। সরস্বতী বলিতেছেন, "কি সুন্দর মুখশ্রী! কি মধুর নৃত্য!" আবার বলিতেছেন,—"হে মনোচোর, তুমি আমার সমুদায় হরণ করিলে? সরস্বতী বলিতেছেন—

> নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি র্লৌকিকী বৈদেকী যা
> যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
> যে বা ভুবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্ম্মা,
> গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি যে তীব্রবীর্য্যাঃ॥ ৬০?

অর্থাৎ—"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার

নিষ্ঠা-প্রাপ্ত লৌকিকী ও বৈদেকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃসরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি যে বিষয়ক লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ-স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।”

এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুলটাগণ কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুলশীল স্বামীসন্তান সমুদায় বর্জ্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন। তিনি যে জপ তপ প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম করিতেন তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম্ম গিয়াছে, নৃত্য-গীত প্রভৃতিতে যে ঘৃণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চৌর তৎসমুদায় হরণ করিয়া লইয়াছেন! প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্কর পুরুষ ছিলে? একটী গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল? ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের ন্যায় হাস্য করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন—“আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না। হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ! আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।” রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার প্রভুর চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ। এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।" ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে আপন মনের ভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আশ্রয় করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম—

কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। ধ্রু।

চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে, এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে।
ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর, টলিত না মন কোন কালে।
নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ, বালকের মত চপল করিলে।
সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন, সকল ত্যজি সন্ন্যাসী হ'লাম।
আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন, আবার তুমি প্রেম-ফাঁদে ফেলিলে।"

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "বৃন্দাবনেই তুমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না?" প্রভু কহিলেন, "সত্যই, স্মরণ করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে।" সরস্বতী কহিলেন, "আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম।" প্রভু কহিলেন, "এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম হইল "প্রবোধানন্দ"।"

প্রভু এক পথে নীলাচলে ফিরিলেন, আর প্রবোধানন্দ অন্য পথে বৃন্দাবনে গেলেন।

প্রবোধানন্দ পূর্ব্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু দশ-সহস্র শিষ্য সহিত

সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন। এখন বৃন্দাবনে নন্দকূপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য-স্থানে বাস করে ;—এখন আপনিই কাশী ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের আশ্রয় ভাবিতেন ;—এখন অন্য ধ্যান ও চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যখন এই তরঙ্গ খেলিতেছিল, তখনই "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ লিখিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটী মহা উপকার পাইতেছেন। প্রথমতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কিরূপ বস্তু ছিলেন তাহা আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ব্যক্তির নিকট জানিতে পারিতেছি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লেখা। দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবানের অবতারে বিশ্বাস লোকের সহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস সুলভ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন সন্ন্যাসী,—যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়া-ছিলেন,—এখন প্রেম ও ভক্তির আস্বাদন পাইয়া, পূর্ব্বে যে ব্রহ্মানন্দ (জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উত্থিত হয়) ভোগ করিতেন,—তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই পর্য্যন্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুকী-ভক্তির সুধা যিনি পান করিয়াছেন, তিনি জ্ঞান-যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

ফলকথা, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন। তাঁহারা ভাবেন যে, সামান্য ভক্তের কোন অলৌকিকী শক্তি নাই। তাঁহার অপেক্ষা, যাঁহার মস্তকে পিপীড়ার

চিবি হইয়াছে, তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর শেষোক্ত (তাঁহার পরীক্ষিত) পদ্ধতি ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

প্রবোধানন্দকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভু যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে আবার সেইরূপ বন্যপশুদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, মুরারীর কড়চা অনুসারে, এই সময়কার একটী মধুর কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গী দুইজন বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, একটু পশ্চাতে। একটী গোপযুবক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত গোয়ালার নিকট সেই তক্র চাহিলেন। তখন গোয়ালা প্রভুর সম্মুখে কলস রাখিল, আর প্রভু কলসস্থ সমুদায় ঘোল পান করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, "ঠাকুর, ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়।" তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ মূল্য লইয়া কি করিবে?" গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী ও বৃদ্ধ-মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তখন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, যাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উচিৎ মূল্য পাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন, "গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধমাতা আছে। আমারওত স্ত্রী ও মাতা আছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি।" এই ভাবিয়া প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত

ব্যাকুল হইলেন, ও তখনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন। এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, "ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সমুদায় পান করিয়াছেন ; মূল্য চাহিলে বলিলেন, আপানারা দিবেন।" বলভদ্র প্রভুর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক! গোপকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভৃত্য, আমাদেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।" গোপ এই কথা শুনিয়া সুখীই হউক আর দুঃখীই হউক, আর কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি যে তাহা তুলিতে পারা যায় না। তখন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার উচিৎ? আমি বৃথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান করুন।" প্রভু তাহাকে আশ্বাস বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর কৃপায় অর্থ ও পরমার্থ দুইই পাইলেন। মুরারিগুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপান-লীলা এইরূপ বর্ণিত আছে—

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগচ্ছন্ কৃপানিধিঃ।
দৃষ্ট্বা গোপযুবাচেদং সতক্রকলসং প্রভুঃ॥

পিপাসিতোঽহং তক্রং মে দেহি গোপ যথাসুখং।
শ্রুত্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ॥
হস্তাভ্যাং কলসং ধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ।
পিত্বা গোপকুমারায় বরং দত্বা যযৌ হরিঃ॥

অর্থাৎ "এই প্রকারে প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্রকলস সহ যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—ওহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর।" গোপ তাহা শুনিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্ত-বৎসল প্রভু দুই হস্ত দ্বারা সেই তক্র-কলস ধারণ-পূর্ব্বক পান করিলেন এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।"

প্রভু দ্রুতগতিতে বন্যপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশেষে পুরী নগরীর সন্নিকট আঠারনালায় আসিয়া ভক্তগণের নিকটে তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভক্তগন আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্র তাপে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে ও মৎস্যগণ জল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময় অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে এক পশলা বৃষ্টি হইল। অমনি সকলে নবজীবন পাইয়া দিগ্বিদিগ জ্ঞান-শূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ প্রভুর বিরহে মরিয়া ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার সংবাদ শুনিয়া প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকটে দৌড়িলেন। তাঁহারা প্রভুর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমে ভারতীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও গৃহী-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, এবং সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগন্নাথমন্দিরে শ্রীমুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন যে, অদ্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না,

সকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন। বহুদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আসুন ভক্তগণ, এই প্রভু-ভক্তে মিলন ও ভোজন, আমরা অন্তরে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্ন্যাসের পরে ছয় বৎসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যখন উনবিংশতি বৎসরের তখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, আর সেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্ন্যাসের কিছু-পূর্ব্বে প্রভু ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গয়াধামে গমন করেন। সন্ন্যাসের পরে রাঢ়দেশে তিন-দিবস ভ্রমণ করেন। তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণদেশ শ্রীপদ দ্বারা পবিত্র করেন। নীলাচলে প্রত্যবর্ত্তন করিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া, গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্য্যন্ত গমন করেন। আবার সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলে পুনরায় আগমন করেন। শেষে বনপথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া নীলাচলে আইসেন। এইরূপে ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ছয় বৎসর কাটিল। প্রভুর বয়স তখন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট ছিলেন এবং বরাবর নীলাচলে বাস করেন। শেষ ১৮ বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা হয় মাত্র তাহাই এখন বর্ণনা করিব। প্রভু বনপথে বৃন্দাবন হইতে আসিবামাত্র স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত দিন স্থির করিলেন ও শিবানন্দ পথের ব্যয়ের ভার লইলেন। তারপর ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চারিমাস প্রভুর নিকট রহিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় মহোৎসব, জলক্রীড়া, কীর্ত্তন, মন্দিরমার্জ্জন, রথাগ্রে নৃত্য, বন্যভোজন ইত্যাদি এবং নন্দোৎসব হইল। এইরূপে চারিমাস সেখানে থাকিয়া ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট তাঁহার বাসা, প্রভু প্রত্যহ স্নান করিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রত্যহ গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া আইসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিলেন। তিনিও জাতিভ্রষ্ট; তাই আর কোথায় যাইবেন, হরিদাসের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রূপ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, প্রভুর তখনি সেখানে আসিবার কথা। এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তখন প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু তখন সহর্ষে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপ হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ দেশে যাইবার পরও রূপ রহিলেন। কারণ, প্রভু তাঁহাকে আপনার কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সেই বৎসর প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময় একটি শ্লোক বলেন। শ্লোকটি কাহার রচিত, তাহা জানা নাই, তবে কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটি এই :—

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥

শ্লোকটীর ভাবার্থ এই—কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাথ! সেই তুমি সেই আমি। সেই আমরা মিলিত হইয়াছি। কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

শ্লোকটী যে অদ্ভুত তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগন্নাথ রথে চড়িয়া সুন্দরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি এই শ্লোকের কি সম্পর্ক আছে যে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র স্বরূপ উহার ভাব বুঝিয়া আস্বাদন করিতেছেন, অপর কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি ঐ ভাবের একটি শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

রূপ এই শ্লোকটি তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু স্নান করিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। সেই নিয়মানুসারে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তখন রূপ স্নানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাসায় যাইবেন এমন সময় ঘরের চালে তালপত্র দেখিয়া উহা লইলেন এবং উহাতে লিখিত শ্লোকটি পড়িলেন, এমন সময় রূপ সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলেন।

প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে ?" শ্রীরূপ এ কথায় কৃতার্থ হইলেন। প্রভু কিছুক্ষণ পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল ?" স্বরূপ বলিলেন, "ইহাতে বুঝা গেল যে তিনি তোমার কৃপাপাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীরাধার ভজন মধুর-রস লইয়া। রাধাকৃষ্ণ ভজনের উপকরণ আদি-রস অর্থাৎ মধুর-রস। এ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা, যখন তাঁহার রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা করি, তখন কতক লিখিয়াছি। শ্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায় ? প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া আপনাকে রাধা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা, দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। রাধার তাহা সহ্য হইবে কেন ? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে এত লোকের মাঝে কেন ? ওরা তোমার কে ? চল, তুমি ও আমি দুইজনে নিভৃত স্থানে গমন করি,—করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফল কথা, রথাগ্রে নৃত্য করিতে গিয়াই প্রভু বাহ্য হারাইয়াছেন। তখন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি (রাধা) কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এই আনন্দে প্রভু রাধাভাবে নাচিতে নাচিতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের শ্লোক প্রভুর হৃদয়ে তখন উদয় হয়, আর সেই শ্লোক শুনিয়া রূপগোস্বামী বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্যপ্রকাশের ভাব লইয়া

রাধাকৃষ্ণ-লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী দ্বারা ইহাই বলাইতেছেন যে—"হে কৃষ্ণ! যদিচ তুমি আর আমি দুইজনেই এখানে, তবুও সেই বৃন্দাবনের কথা—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথম মিলনে যে সুখ হয় তাহাই মনে পড়িতেছে। সে মিলনের সুখ এ মিলনে আমি পাইতেছি না।"

শ্রীরূপকে দশমাস নিকটে রাখিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া দিও।" রূপ গৌড়পথে, এ জীবনের মত, বৃন্দাবন গমন করিলেন। কিন্তু সনাতনে ও রূপে, প্রভুর ইচ্ছায়, দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে রূপ ও অনুপমকে বিদায় দিয়া, প্রভু বারাণসী আসিলেন এবং সেখানে সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অনুপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার দেশে আসিলেন। এদিকে সনাতন প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত অবস্থায় রূপ ও অনুপমের সহিত সনাতনের পথে দেখা হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। কারণ, একজন রাজপথে ও আর একজন নির্জ্জন পথে, গিয়াছিলেন। রূপ ও অনুপম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করেন। সেখানে অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। তখন রূপ একক প্রভুর নিকট গমন করিয়া কি কি করিলেন তাহা উপরে বলিয়াছি।

এদিকে সনাতন বৃন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে না যাইয়া ঝাড়িখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। পথে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝাড়িখণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার এই ব্যাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কিম্বা পূর্ব্বে যে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্তও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্যাধি হওয়ায় সনাতনের বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইল না। পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান অমাত্য বলিয়া বহু মান্য করিত, এখন ব্যাধিগ্রস্থ বলিয়া সকলে অস্পৃশ্য ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মহা আনন্দ। সনাতনের এরূপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। প্রভুর সংসর্গে সনাতনের পূর্ণ মাত্রায় চৈতন্যের ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। তখন জগতের আদর ও ঘৃণা উভয়েই তাঁহার নিকট সমান হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন, তৎসমুদায় এখন জলন্ত-অঙ্গারের ন্যায় হৃদয়ে ক্লেশ দিতেছে। কিসে এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তি হইবে সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত আশান্বিত হইয়াছেন বটে, এবং পরকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই ;—কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের সৃষ্টি হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে তাঁহার স্পর্শ দেব-গণও বাঞ্ছা করেন ;—কিন্তু সনাতনের মনে সে সব কথা স্থান পায় না। তিনি ভাবেন, প্রভু করুণাময়, পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত গোলক ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় অধম-জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী ;—সুতরাং সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, সে আর বিচিত্র কি ? কিন্তু তাহাতে তাঁহার (সনাতনের) কোন গৌরব নাই,—গৌরব প্রভুরই। বরং প্রভু যে তাঁহাকে এত আদর করেন, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি-অধম. কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার। আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিবেন। সুতরাং এই যে তাঁহার কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে

সনাতনের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি ভাবিতেছেন যে, প্রভুকে দর্শন করিয়া রথচক্রের নীচে অপবিত্র-দেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই ভাবিতে-ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই। তাই তল্লাস করিয়া হরিদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়াই হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাসও উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর কখন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি হরিদাস ও সনাতন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন!" প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে দুই বাহু প্রসারিত করিলেন। কিন্তু সনাতন পশ্চাৎ হটিয়া বলিতেছেন, "প্রভু করেন কি? আমাকে ছুঁইবেন না। আমি একে ঘোর পাপী অস্পৃশ্য-পামর, আবার তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইয়াছে ও তাহা হইতে ক্লেদ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব শুনিলেন না। বল দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তখন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তগণ পিড়ায় বসিলেন, সনাতন ও হরিদাস দুইজনে পিড়ার তলে বসিলেন। তখন সকলে ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন। কিন্তু অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া প্রভু অনুপমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন। সনাতন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই; এখন শুনিয়া একটু কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, যত প্রকার

অন্যায় ও অধর্ম্ম, আমাদের কুলধর্ম্ম। ইহা সত্ত্বেও তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। সুতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গল। অনুপম ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে আমার ভাইয়ের ভক্তির যে প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহার পোষকতায় এক কাহিনী বলিতেছি। আমার ভাই অনুপম রঘুনাথ উপাসক। আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, "যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" অনুপম আমাদের অনুরোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না।" ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্ঢ্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভু বলিলেন, "মুরারীকেও আমি ঐরূপ পরীক্ষা করিতেছিলাম। মুরারী রঘুনাথ ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন শিক্ষা করিলেন।" তাহার পর প্রভু একটী অদ্ভুত কথা বলিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আমরা এখানে ভক্তের গুণানুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর শ্রীভগবান্, তিনিও সেইরূপ মহাশয়—বন্ধু। ভক্ত সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সত্য, আবার সেবক যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপথে যায়, তবে ঠাকুরও তাহাকে চুলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।"* প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণকথায় যাপন কর। তোমরা দুইজনে কৃষ্ণপ্রেমে প্রধান। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন।"

---

* প্রভু! এই আশ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব তোমার যেন সে কথা মনে থাকে।

সনাতন হরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের নিমিত্ত প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, কারণ একে তিনি নীচজাতি (অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে), তারপর তিনি কুষ্ঠগ্রস্ত। হরিদাসের ন্যায় তিনিও শ্রীজগন্নাথ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে যান না, দূর হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন! সনাতনের মনে সঙ্কল্প রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সেই ক্লেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

সনাতনের এরূপ মনের ভাব সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর অবশ্য অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন! একটী কথা বলিব, শুন। যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে আমি এক মুহূর্ত্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা প্রকৃত ধর্ম্ম নয়,—উহা তমোধর্ম্ম! যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণত্যাগ করে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অল্প। সে তো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে, আপনাকে দুঃখ দিয়া কৃপা আহরণ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণ ত নিষ্ঠুর নহেন। তবে কেহ-কেহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটে, সে, তাঁহারা কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া মরিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি-বিরল, আর তাঁহাদের নিয়মও অন্যরূপ। যদি কেহ কৃষ্ণ বিরহে মরিতে চাহেন, তবে কৃষ্ণ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। কিন্তু যাঁহারা আপন

প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে জব্দ করিতে পারেন না। অতএব সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাঞ্ছা ছাড়, কীর্ত্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীকৃষ্ণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতিবিচার নাই,—বরং যাহারা হীন-জাতি, তাদের ভজন সুলভ হয়। যেহেতু যাহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাহারা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অধিকারী নহে।”

প্রভুর শিক্ষাগুলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেশে নয়, সর্ব্ব-স্থানেই দেখা যায় যে, লোকের বিশ্বাস, আপনাকে দুঃখ দিয়া শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায়। কিন্তু প্রভু বলিতেছেন যে, শরীরের কষ্ট অল্প-কথা, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, কারণ তিনি মঙ্গলময় বন্ধু। তিনি নিষ্ঠুর নন যে, তুমি কষ্ট পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত যতই কঠোর কর সে বিফল। প্রবোধানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসীদিগের মাননীয়। এদেশে বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসীর ন্যায় প্রধান-আশ্রয় আর নাই। কিন্তু প্রবোধানন্দের দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, সন্ন্যাস করিলে কৃপা লাভ করা যায় না। প্রভু নিজেও সর্ব্বদা বলিতেন যে “প্রেমই জীবের প্রয়োজন, সন্ন্যাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদবিধি ধর্ম্মের দাস।” এদেশের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরূপ কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে প্রাণ গেলেও পারেন না। যখন সার্ব্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভু আনন্দে তাঁহাকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,— “তুমি বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, আজ তুমি প্রকৃত কৃষ্ণদাস হইলে।” ইহাতে মনে হয় যে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের মত পালন করিলে মনকে বিধির অধীন করিয়া জড় করিয়া ফেলে। অতএব এই

বেদবিধিগুলি জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার ভজন-সাধন পদ্ধতি বালক বৃদ্ধ সকলেই বুঝিতে পারেন।

প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "আমার সংকল্প প্রভুর গোচর হইয়াছে। আবার আমার সংকল্প, প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে, আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্নেহ কেন?" এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি দ্রবীভূত হইলেন, হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্ব্বজীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। কিন্তু প্রভু, তুমি আমাকে বাঁচাতে চাও কেন? আমার ন্যায় ছারের দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে?" প্রভুও তখন দ্রবীভূত হইলেন। কারণ তিনি কাহার চক্ষে জল দেখিতে পারেন না। প্রভু বলিলেন, "সনাতন বল কি? তোমার দ্বারা আমার কোন কার্য্য হউক আর না হউক, সে আমার বিচারের বিষয়। তোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, ইহা আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই। তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাও, এ তোমার কি বিচার?" একটু থামিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহ দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। তোমাকে সেখানে রাখিব। তুমি বলিতেছ, তোমর দেহ কি কাজে আসিবে? তোমার ঐ দেহ দ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার পাইবে। তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অন্যায় দেখ; সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উহা নষ্ট করিতে চান। জীবের মঙ্গলের জন্য ঐ দেহ দ্বারা আমি নানা কার্য্য সাধন বরিব, তাহাই তিনি

অতি নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া দিতে চান, ইহা কিরূপে সহ্য করিব ?”

সনাতন তখন গদগদ হইয়া বলিলেন, “প্রভু, তোমার হৃদয় আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরূপ নাচাও, সে সেইরূপ নাচে। যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার-দেহ দ্বারা কোন কার্য্য করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি ?” কিন্তু প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন না। তিনি সনাতনের হাত ধরিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, “বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি তোমার দেহ নষ্ট করিবে না ?” সনাতনও তখন অঝোর-নয়নে ঝুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, “প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।” প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, “প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব ? ইহারা কয়েক ভ্রাতা কোথায় ছিল, কি ছিল ? ইহাদিগকে আনয়ন করিলে। এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিবে। তোমার এ ভঙ্গী আমরা কিরূপে বুঝিব ?”

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, নিতি নিতি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেখা হয়, আর প্রভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আর প্রত্যহই প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া যায়। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত নীলাচলে আসিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। একদিন যমেশ্বর টোটায় মহোৎসব হইল। প্রভু সেখানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে বেলা দুই প্রহরের অধিক, সূর্য্যতেজে সকলে ম্রিয়মান। সনাতন

প্রভুর আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তখন তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পথে আসিলে?" তিনি বলিলেন, "সমুদ্র পথে।" প্রভু বলিলেন, "সেকি! সমুদ্রপথ বালুকাময়, সে পথে এ রৌদ্রে চলাফেরা যায় না। পায়ে নিশ্চয় ব্রণ হইয়াছে। তুমি কেন মন্দিরের শীতল-পথে আসিলে না?" সনাতন বলিলেন, "কই আমি তো কোন কষ্ট পাই নাই!" প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু ডাকিতেছেন, এই আনন্দে তপ্ত-বালুকায় পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে তাহা সনাতন জানিতেও পারেন নাই। সনাতন বলিলেন, "মন্দির-পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, কারণ আমি নীচ, কি জানি হয়তো কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভু ইহাতে গদগদ হইয়া বলিলেন, "তুমি যে ইহা করিবে তাহা জানি। তুমি তোমার স্পর্শদানে ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ ভক্তি কিরূপে হইবে? আমি এরূপ দৈন্য চিরদিন বড় ভালবাসি। তাহার পরে, যে প্রকৃত মহান্, তাহার যে দৈন্য সে আরো মধুর। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই দুইপ্রহর বেলায় ডাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র-পথে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা জানিতাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগিয়া গেল।

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, তবু তাঁহার মনে দুইটি ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি ব্যাধিগ্রস্থ; তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার এই রোগ, সুতরাং তাঁহার

দ্বারা জগতে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা? লোকে তাঁহাকে মানবে কেন? বরং কুষ্ঠগ্রস্থ বলিয়া সকলে ঘৃণা করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে, তাহার নিকট লোক ভক্তি কেন শিখিবে? তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে? তাহার পর, প্রভু তাঁহাকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করেন, সেই তাঁহার মহাদুঃখ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে, এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না। প্রভু তাহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করেন, তাঁহার ইহা কিরূপে সহ্য হইবে? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যে সনাতনের কণ্ডুরস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশ্য ক্ষোভ হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যেহেতু প্রভু তাঁহাকে জোর করে আলিঙ্গন করিতেন। তবু সনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। প্রভু অন্যান্য সময় সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সেদিন সর্ব্বভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। কারণ সে কার্য্যটা পাপ, আর ইহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন? অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত সনাতন একদিবস জগদানন্দকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে দুঃখ খণ্ডাইতে আসিলাম; ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বল দ্বারা আলিঙ্গন করেন। কত নিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহার সহ্য হয়?

কিন্তু করি কি, প্রভু স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি করিব ?"

জগদানন্দ, প্রভু ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মানুষ, বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম নহে। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে, ইহাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোষ্ঠিকে বৃন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।" জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহাকে যে প্রভু আলিঙ্গন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের সুখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্ত্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে গমন করিলেন না, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে এস।" সনাতন বলিতেছেন, "নিকটে আর না, এখান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আর সনাতন পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন; প্রভু মহা বিপদে পড়িলেন। কিন্তু প্রভুর সহিত সনাতন পারিবেন কেন ? তিনি সনাতনকে তাড়াইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদ্বারা হৃদয়ে আনিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ায় বসিলেন! প্রভু পার্ষদগণসহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলে, তখন হরিদাস ও সনাতন পিঁড়ার নীচে, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিঁড়ার উপরে বসিতেন। কিন্তু সেখানে অন্য কেহ

নাই, কাজেই মর্য্যাদা রাখার প্রয়োজন নাই ; তাই তিনজনে একত্রে বসিলেন।

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরঙ্গ সম্মুখে স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করেন, স্বামীর অতি-নিকটে গমন করেন না। নির্জ্জনে শয়নাগারে তাঁহার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, আর ভক্তের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি ? তিনি না অনন্তগুণে প্রকাণ্ড ? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর সেখানে কোন বহিরঙ্গ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া দূরে যান। সেইরূপ যখন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিঁড়ার উপর একত্র বসিয়া ইষ্টগোষ্টি করিতেছিলেন, তখন যদি কোন ভক্ত সেখানে যাইতেন, তবে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তখন পিঁড়ার নীচে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজজন হৃদয়ের ধন। শ্রীভগবান স্ত্রী ও স্বামী হইতেও অন্তরঙ্গ। আর এই জ্ঞান কথায় ও কার্য্যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু জগতে আবির্ভূত হয়েন।

সনাতন তখন সকাতরে মনের সমুদায় কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আসিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে-পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে স্পর্শ করে তাহার যোগ্য আমি নই, তাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দূরে থাকিব, না আমি তোমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি ! লোকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের দুর্গন্ধময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য ক্লেশ পাইবেন। পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে

যে, আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্তু কি করি? তুমি পতিতপাবন, পরম-দয়াল, চন্দন-বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘৃণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ দুর্গন্ধ ক্লেদ পর্য্যন্ত অঙ্গে মাখিতে কুণ্ঠিত হও না, তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু, স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি স্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার সুখ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার সে আজ্ঞা পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেইখানে যাই, আর যে কয়েকদিন বাঁচি, সেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। তিনিও বলিলেন যে, আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করাই কর্ত্তব্য।” সনাতনের কথা শুনিয়া, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইয়া বলিলেন, “বটে! তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয়? সেকি তাহার নিজের মূল্য জানে না? কি ব্যবহারে, কি পরামর্শে, তুমি তার গুরুর তুল্য।”

সনাতনের মনে পূর্ব্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে। সে ক্ষোভের কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গৌরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হইলেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের সৌভাগ্যও জানিলাম। প্রভু, তুমি আমাকে ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সম্মান ও স্তুতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ-জন তাই তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। আমারও এ বড় দুর্ভাগ্য যে,

আজও আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না? কিন্তু করি কি তুমি স্বতন্ত্র ভগবান!"

যদিও আমার সরল-প্রভুকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্যায়। কারণ প্রভু যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়, প্রকৃতই স্তুতির উপযুক্ত বলিয়া। তবু কিন্তু রাজমন্ত্রীর বাগ জালে সরল-প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তুতি করি, সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তুতি করায়। জগদানন্দ আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিয় নহে। কোথায় তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ! তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্ব্বাংশে প্রবীণ, আর সে বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপদেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করি? মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তার পরে, সনাতন! তোমার দেহ তুমি বিভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে দুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাসিকায় তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।" এ কথা ঠিক। যেদিন প্রভু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সনাতনের অঙ্গের দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইয়া সুগন্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অন্য সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তারপর প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন। তোমার দেহ তুমি অতি ঘৃণার দ্রব্য বলিয়া ভাব, কিন্তু প্রাকৃত তাহা নহে, উহা অপ্রাকৃত। ওরূপ পবিত্র-দেহে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি

সন্ন্যাসী, আমার এখন বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত। আমি কিরূপে তোমার দেহকে ঘৃণা করিব? তোমার দেহকে ঘৃণা করিলে আমি কৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইব।” সনাতন তখন একটু কোমল হইয়া বলিতেছেন “প্রভু তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সমুদায় বাহ্য প্রতারণা; উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ঘৃণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই যে, তুমি দীনদয়াল। তোমার কার্য্য আমার ন্যায় অধমকে কৃপা করা, আর তোমাব ঠাকুরালী আমার ন্যায় পতিত লইয়া।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন, “যদি স্বরূপ কথা শুনিতে চাও, তবে বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরূপ অভিমান করিয়া থাকি,—যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ কাজ মন্দ বলিয়া দেখে? সন্তানের লালা প্রভৃতি মাতার সর্ব্বাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি তাঁহাতে দুঃখ কি ঘৃণা হয়? বরং মহা সুখ হয়।”

হরিদাস বলিতেছেন, “সে যাহাহউক, প্রভু তোমার গভীর-হৃদয় আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিরূপ কৃপা কর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত! বাসুদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্রে যে কুষ্ঠ তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার গলৎকুষ্ঠে তাহার অঙ্গ কীড়াময় হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া পরমসুন্দর করিলে। অথচ সনাতন তোমার”—ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

হরিদাস ভঙ্গীতে এত দিনে তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভু স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বারবার বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, উহার দ্বারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ

তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভুকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ একথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে এ পর্য্যন্ত একবারও প্রভুকে বলেন নাই। তুমি আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, "প্রভু, আগে আমার রোগটী আরাম করিয়া দাও, পরে আর কথা।" যখন হরিদাস স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকট সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, তখন প্রভু উহা মোটে বুঝিলেন কি না, তাহা জানা গেল না। অর্থাৎ বাসুদেব বলিয়া কোন এক অপরিচিত ব্যক্তির গলৎকুষ্ঠ ছিল এবং তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন; অথচ পরিচিত সনাতনকে সেরূপ কৃপা করেন নাই,—এ সমুদায় কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বকার কথা লইয়া বলিলেন, "ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না।" তারপর বলিলেন, "সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। কারণ যদি আমি এই ব্যাধি দেখিয়া ঘৃণা করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইতাম।" তারপর সনাতনকে বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় সুখ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি আমার এখানে থাকো। বৎসরান্তে তোমাকে রন্দাবন পাঠাইব। "এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গন। কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।"—চরিতামৃত।

এখন আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস সনাতনকে এরূপ দুঃখ দিলেন? তিনিতো দর্শনমাত্র তাঁহাকে আরাম করিতে

পারিতেন ? সনাতনের মনে যেটুকু দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্তু, প্রভু তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে মহাসম্মান করিবেন ; এমন কি, তাঁহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ করিয়া আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিবেন,—ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে নিন্দা করেন। কাজেই সনাতন সঙ্কল্প করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন না, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ দুঃখ উদয় না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহিতেন না। তবে তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু, আমাব ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও।"

প্রভু সনাতনের দ্বারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন। প্রথম দেখাইলেন, কুকর্ম্ম করিলে ফল ভোগ করিতে হয়। তারপর দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারেন না, তাঁহার অঙ্গে যদি কুষ্ঠও হয়, তবুও তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্থ ভক্তকে করিতে পারি ? তৃতীয় দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সন্তানকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈন্য হ্রাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। চতুর্থ দেখাইলেন যে, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা। তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, স্বয়ং শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, একদিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এই সমুদায় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই,

এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রভুর গণের নিজ সুখ অনুসন্ধানের অনুমতি নাই। বৃন্দাবনে যাও যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না,—ইহাই প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছুকাল থাকিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন,—কোন পথে, না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সেই পথের ও যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া লইলেন। বিদায়ের সময় হইলে, প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—"দুই জনের বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে,—তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে সনাতনকে রাখেন, আর সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্ত্তব্য জীবের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃন্দাবনে যাইবার পর শ্রীরূপ, গৌড় হইতে সেখানে আসিলেন। তাহার অনেক পরে তাঁহাদের কনিষ্ঠ অনুপমের পুত্র শ্রীজীব যাঁহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাখিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং তিনিও বৃন্দাবনে দৌড়িলেন। পূর্ব্বে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃন্দাবনের কর্ত্তা হইলেন। এই গোষ্ঠি বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিলেন—যে বৃন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল, যেখানে প্রভুর চর, লোকনাথ ও ভূগর্ভ, প্রথমে যাইয়া, কোথা রাসস্থলী খুজিয়া পান নাই, সে স্থল ক্রমে সাধুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভুবন পবিত্র করিতে সক্ষম।

এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভগবতামৃতে। ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনি। কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিন্দের-সেবা প্রকাশন ॥
রূপগোঁসাই কৈল রসামৃতসিন্ধুসার। কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে নিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর। কৃষ্ণধারা-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥
দানকেলিকৌমুদি আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। সে সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥
সর্ব্বত্যাগি তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন। তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার। ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাই পার ॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল ? ব্রজপ্রেম-লীলারস সার দেখাইল ॥
ষটসন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল ! চারি লক্ষ গ্রন্থ দুহে বিস্তার করিল ॥

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ দুই ভাই কান্থা ও করা সম্বল করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন ! সেখানে যাইয়া দেখেন যে, বৃন্দাবনে স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুসলমান-দস্যুর উৎপাতে এই পবিত্র-স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, তীর্থস্থানের কোন চিহ্ন নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল অসভ্য বনবাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই উজাড়-বৃন্দাবন উদ্ধার করা প্রভুর আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা পালন করেন এরূপ ধন-জন কিছুই তাঁহাদের নাই ! ছিল কেবল প্রভুদত্ত-শক্তি। ইহাই ধন-জন হইতে তাঁহাদের অধিক সহায়তা করিল। তাঁহাদের বৈরাগ্য এরূপ যে, পাছে মায়ায় আবদ্ধ হন তাই দুই ভাই এক স্থানে থাকিতেন না ; এক বৃক্ষতলে দুই

রাত্রি বাস করিতেন না, পাছে—সে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। শীতে-বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস ; উপবাস করেন, তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন তাহা তো জানেন ? তিনি বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অন্ন আপন স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই।" অর্জ্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া যাইব" এ কথা কখনো হইতে পারে না। কৃষ্ণ আপনি তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে করিয়া অন্ন বহিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা কি ভাল কথা ? ভক্ত একথা কিরূপে লিখিবে ? তাই ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন মিশ্র ঐ শ্লোক কাটিয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বটে ? তুমি বুঝি আমার পদ বাড়াইলে ? আমার এমন ভক্ত, যে আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাস করে, আমি তাহার নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, ইহাতে যে সুখ তাহা অন্যকে দিয়া আমি কেন বঞ্চিত হইব ? ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনমিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব। সেখানে রূপসনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন ?

দুই ভাই ছেঁড়া কাঁথা স্কন্ধে করিয়া সেই জঙ্গলে গমন করিলেন। ক্রমে দুই এক জন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট আকবর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আকবর শুধু যে আগমন করিলেন তাহা নয়,—ভারতবর্ষের সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সম্রাট তাঁহাদের চরণে শরণ লইলেন। আকবর ধন দিতে চাহিলেন। সনাতন বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি ?" অমনি আকবর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন রত্নমাণিক্য-খচিত ! তখন তিনি গদগদ ভাবে বলিলেন,—অপরাধ

হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমি সামান্য রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যখন এই দুই ভিক্ষুক বৃন্দাবনে গমন করিলেন, তখন সেই জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত। ক্রমে সেখানে মন্দিরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির হইল। গোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় সুন্দর দেবস্থান জগতে আর নাই। উহা নির্ম্মাণ করিতে কোটী টাকার কম ব্যয় হয় নাই। গোস্বামীগণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ভিক্ষুকগণ এত টাকা কোথায় পাইলেন? ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন,—তিনি স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এত শক্তি আর কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, "সনাতন, বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" তখন সনাতনের গাত্রে একখানি ভোটকম্বল দেখিয়া, প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন, "অগ্রে এই তিনমুদ্রার কম্বলখানি পরিত্যাগ কর, তারপর বৃন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" কাজেই সনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ-সনাতনের যে অতুল-ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে অনেক মন্দির হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রভু সে অতুল-ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও লইয়া যাইতে দিলেন না। তাঁহাদিগকে কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিয়া শেষে বলিলেন, "যাও, এখন বৃন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া।" তাঁহারা সেই অবস্থায় বৃন্দাবনে যাইয়া শত-শত মন্দির করিলেন। তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

কেন এই দুই অতুল-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, রত্নখট্টা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইঁহাদের কথা লোকে এরূপ মান্য করিতে লাগিল?—তাঁহাদের চরণে যথাসর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইল? কেন

একজন সম্রাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন ? কিরূপে এই দুই ব্যক্তি বিনা-সম্বলে জঙ্গলের মধ্যে মহানগরী সৃষ্টি করিলেন ? কিরূপে ইঁহারা সহস্র সহস্র পণ্ডিত-সাধু-সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু (যাঁহাকে ঐ সমস্ত লোক কখনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবান ? ইহার উত্তর এই যে,—আমাদের শ্রীপ্রভু সত্য-বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র ভেলকী নাই, সমুদায় খাঁটি। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র রূপ-সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মনুষ্যে যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর মধ্যে কিছু ভেলকী থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলখানি ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ-সনাতনকে অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি বঞ্চক হইলে রূপ-সনাতনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই দুই কাঙ্গাল দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বৃন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর সৃষ্টি করাইলেন।

এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা কিছু বলিব। প্রভুর জ্ঞাতি শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম্ব, প্রভুর উপর তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু প্রভু কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছু বলেন না। প্রভুর কাছে যাইয়া তিনি বলেন, "প্রভু, আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ-কথা বলিতে পারি না, উহা রায় রামানন্দ জানেন, আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা, তাঁহার কাছে যাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণটিকে বিদায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রদ্যুম্ন করেন কি, তিনি রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য মুখে শুনিলেন যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভৃত্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মিশ্র মহাশয় কিছুক্ষণ বসিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিলেন, "তিনি দেবদাসীকে অভিনয় শিখাইতেছেন।" প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে সমুদায় বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়ের নিজকৃত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম "জগন্নাথবল্লভ"। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিত্ত, মন্দিরে যে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া-বাছিয়া সুন্দরী ও যুবতীগণকে লইয়া রামরায় তাঁহার নিভৃত-নিকুঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস দুইজন দেবদাসীকে লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। তিনি কিরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥"

রায় নিভৃতস্থানে এই সমুদায় কাণ্ড করিতেছেন শুনিয়া মিশ্রঠাকুর অবাক হইলেন। ইহাতে অবশ্য রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। কিছুক্ষণ পরে রামরায় আসিলেন এবং আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি দুই-চারিটি বাজে-কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রদ্যুম্ন আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?" প্রদ্যুম্ন বলিলেন যে তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আস্তে-আস্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা

গাইতে লাগিলেন ; বলিলেন, "প্রভু, তোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী লইয়া, নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জ্জনা করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া—এসব কি বড় ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত অপর কেহই বুঝিবে না যে, কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনার একটা অঙ্গ। স্থূল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে। সঙ্গীত-দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাঁহাদের কৃষ্ণগত-প্রাণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আস্বাদন করান। যত ভাল-ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক রচনা করিয়া, নাট্যশালা করিয়া, কৃষ্ণকে উহা দেখাইবেন, শুনাইবেন—সেই নিমিত্ত, রসাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। সুন্দরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া-গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রসাভাস হইবে ? যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন ? রামানন্দের এই যে ভজন, ইহা সর্ব্বোত্তম ; ইহা হইতে সূক্ষ্ম সুপবিত্র সুধাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই' কোথাও ছিল না ; কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটি আছে, যথা—

পূর্ণচাঁদ আলা, বনফুল মালা, বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বার, রস কবিতার, পদ্ম-ফুল মকরন্দ ॥

সুস্বর সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর, লজ্জা, আলিঙ্গন, মান॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন, কি দিয়া তুষিবে তাঁরে॥

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেহ একটি জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির দিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চান, বলেন—"তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি! কেহ বা আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন; মনে ভাবেন, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভগবান তাঁহার দোষ ভুলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। যেমন ভগবান তেমন তাঁহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসাশী, তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে প্রভু দাম্ভিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বোধ তাঁহাকে তোষামোদ ও নানারূপ বঞ্চনা করিয়া ভজন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আর একরূপ। তিনি সরল, সুবোধ, সুরসিক, দয়াল, অক্রোধ, পরমানন্দ, স্নেহশীল, স্বার্থশূন্য। এরূপ বস্তুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যায়;—আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন। গোপীগণ করেন কি?—না, তাঁহাদের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে কবিতার রসদ্বারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতির দ্বারা ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, কবিতার রস আস্বাদন করান। সুতরাং রামানন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণকে নাটকাভিনয় দেখাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী-যুবতী ও রসিকা-দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন-না তাঁহাদিগকে ব্রজগোপী, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রণয়িনী, সাজিতে হইবে। কৃষ্ণের প্রণয়িনী যদি কুরূপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন, তবে সে বড় অস্বাভাবিক

হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাই এই সেবাটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেজন্য নাটক রচনা করিয়া ইহা বিশুদ্ধভাবে অভিনয় করিতেছেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, যাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন, তাঁহাদের হৃদরোগ কি কামরোগ থাকে না? রামরায় নির্ব্বিকার, তাঁহার হৃদয়ে বিকার নাই। তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।" প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া দ্রুতপদে রামরায়ের নিকট আবার যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম! তিনি বলিলেন, 'আমি উহা জানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি।' আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনেন বটে, কিন্তু তিনিই আমার মুখে বক্তা। যাহাহউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন আপনি কি কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন?" ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন। তিনি কৃষ্ণ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্তু কি তাহা কিছুই জানেন না। তাই দীনভাবে বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর দিউন।" তখন রামরায় একটু ভাবিয়া কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায়-কথায় রস উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণঠাকুরও চলিলেন। রসপান করিতে করিতে উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিয়া ভৃত্য আসিয়া রামরায়কে একপ্রকার বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, ব্রাহ্মণঠাকুর তাহা জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি উহা জানেন? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি শুনিতে জীব বিহ্বল হয়? শ্রীভগবান "পুরুষোত্তম," "নরোত্তম" "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।" তাঁহার সকল গুণই আছে,—আর ইহা আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের লেশমাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব নাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় যে, চক্ষুর অগোচরে কীট কেমন সুন্দর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটি দেহ আছে, দেশ আছে, ঘর আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, অথচ সে বস্তুটি নয়নের অগোচর! ইহা দেখিলে, যে কারিগর উহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভালবাসার ন্যায় অনির্ব্বচনীয় একটি ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর; দেখিবে—তিনি যেমন কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অননুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে,—কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করে। যখন এই সমুদায় মনে চিন্তা করা যায় তখন এই সমুদায় বস্তুর স্রষ্টার উপর আর এক প্রকার ভালবাসার ন্যায় ভাবের উদয় হয়। আবার কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াদি বিচারে তত সুখ নাই, যত তাঁহার হৃদয়-বিচারে সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড়-মহিমা নহে,—তাঁহার বড়-মহিমা এই যে, তিনি অতি মধুর-প্রকৃতি। একজন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমন দয়ালু যে পরদুঃখ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চৈস্বরে কান্দিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন, সেই ব্যক্তির কোন্ গুণ বিচারে অধিক সুখ। তাঁহার কারিগিরি-বিচারে, না তাঁহার হৃদয়-বিচারে? শ্রীকৃষ্ণের কারিগিরি আলোচনাকে যদিও 'কৃষ্ণ-কথা' বলে, কিন্তু সে নিকৃষ্ট।

প্রকৃত 'কৃষ্ণ কথা' কি,—না শ্রীকৃষ্ণের অন্তর বিচার ও চর্চ্চা করা; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পবিত্র, সরল, সমুদায় উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাসার অনেকগুলি বস্তু, আর তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলেই স্বার্থপর ও মলিন, কেবল আমার শ্রীকৃষ্ণ নিঃস্বার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন,—আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার কৃষ্ণকে যদি আমি একবার স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন না। আমি শ্রীকৃষ্ণের একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে-করিতে, আমার বোধ হইল যেন তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর-জীব আমার মনে একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাঁহার শ্রীবদন এক মনে দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না—আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তখন হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। মনে হইল যে—তা বটে, শ্রীকৃষ্ণের অন্যমনস্ক হইবারই ত কথা। কারণ তাঁহার ঘাড়ে কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতে ত পালন করিতে হইবে? এইরূপে যখন আমার হৃদয়ে "অন্যমনস্ক কৃষ্ণ" উদয় হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার ইহাও কখন বোধ হয় যে যেন শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবিতেছেন, আর ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল-ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন!

শ্রীনন্দনন্দনে, ভজিনু কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি মনু।
তাঁর দুঃখ দেখি, মোর দুঃখ সখি, সকলি ভুলিয়া গেনু॥

মনে ভাবুন, "শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-জল", ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তখন ইচ্ছা করে, তাঁহার জলপূর্ণ রাঙ্গা-আঁখি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি,—না, তাহাতে রসভঙ্গ হইবে। এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে, আমিও রোরুদ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাম্বর দিয়া তাড়াতাড়ি আপন নয়ন মুছিলেন, আর আমার দুঃখ দুর করিবার নিমিত্ত বদনে মধুর হাসি আনিলেন!

ফল কথা শ্রীকৃষ্ণের সবই সুন্দর। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা আলোচনা কর তাহাই মধুর। তাঁহার দর্শন মধুর, গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন:—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

সখীরা শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অনুবাদে রাধা বলিতেছেন, "সখি! শ্যাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা, কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্যাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি! যেই নামটি শুনিলাম, অমনি উহা আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া হৃদয়ে বসিয়া গেলেন। না হয়, সেই নাম হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকুন; কিন্তু তাহা নয়, হৃদয়ে যাইয়া আমাকে অস্থির করিলেন। এখন আমার মুখে কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে

কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন, আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন: আর যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ রসে পরিপ্লুত হইতেছেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।

এই গেল প্রভুর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরিদাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট দুই হরিদাস বাস করেন,—ছোট ও বড়; বড় হরিদাসকে সকলে চিনেন। ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্ত্তনিয়া,—প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ সূক্ষ্ম-তণ্ডুল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য বলিলেন, "মাধবী দাসীর নিকট মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল?" আচার্য্য বলিলেন, "ছোট হরিদাস।" প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না; তবে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।" ইহাতে ছোট হরিদাস মর্ম্মাহত হইলেন। অন্য সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছে, প্রভু সেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে,—"সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে দণ্ডার্হ।" ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস। স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। কি লাগিয়া দ্বারমানা, করে উপবাস॥
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র-জীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া॥"

এখন এপর্য্যন্ত সমুদায় বুঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্ত্রীজাতি ; কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি।. এ মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুন—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবীদেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী আর পরমাবৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপগোঁসাই, আর রায় রামানন্দ। শিখিমাহিতি তিন, তার ভগ্নী অর্দ্ধ॥"

হরিদাস মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক, তবু বৃদ্ধা আবার এদিকে পরমা-পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ হইল? অবশ্য, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ কোন কুকার্য্য হইতে পারে না। এটি কেবল শাসন-বাক্য, আর কিছুই নয়। রামরায় যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভৃতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে একেবারেই না-করিতেন, এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অদ্বৈতগৃহিণীর নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড়-একটা পালন করিতেন না! সেখানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন? যাহাহউক প্রভু হরিদাসকে ত্যাগ করিলে, সকলে তাঁহার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর গেল। তখন হরিদাস নীলাচল হইতে প্রয়াগে গেলেন, এবং গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমুদায় কাহিনী পড়িলে মনে

হয় যে, প্রভু ছোট-হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভুর সঙ্গে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী, ইঁহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হন, তবে তিনি বা তাঁহারাই যে শুধু মারা যান এরূপ নহে, জীব উদ্ধারেরও ব্যাঘাত ঘটে। তখন প্রভুকে লইয়া ভারতবর্ষময় চর্চ্চা চলিতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অল্প-বয়স্ক যুবক; ঝোঁকের উপর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। প্রভুর উহা সহ্য হয় না, তাই তিনি ধর্ম্ম-স্থাপন ও জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত হরিদাসকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য ভাবিলেন। অবশ্য তাঁহার প্রতি দণ্ড গুরু কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ না জানিলে নির্ণয় করা কঠিন। তিনি যে মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ্য মাত্র, অপরাধ অবশ্য আরও কিছু ছিল। কারণ প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যে তাহাই বোধ হয়। হরিদাসের "মর্কট-বৈরাগ্য", তিনি "ইন্দ্রিয়-চরাঞা" বেড়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞ-প্রভুর কোন-বিষয় অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্ব্বল্যবশতঃ সন্ন্যাসী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাইতেন," তাই দণ্ড পাইলেন,—মাধবীর নিকট যে তণ্ডুল ভিক্ষা উহা উপলক্ষ্য মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন, আর সেই অনুতাপানলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্ন্যাসী তাঁহার নিত্য পার্ষদ। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয়সুখভোগাভিলাষী হইয়া তাহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন।

আর হরিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুর বৈরাগী-ভক্তগণের মধ্যে ইহাতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, যথা—

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥"

ফল কথা, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না,—সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। কিন্তু যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে আর মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্য জীবকে ও শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিবে না। আবার, হরিদাস বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগীগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দণ্ড করিলেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দণ্ড। এই দুই কার্য্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। শ্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, কৃষ্ণ-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না।

এখন হরিদাসের প্রতি প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা শ্রবণ করুন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, তাহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম-মিলন স্মরণ করুন। ভারতী গোসাঞি চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভজনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন?

প্রভুর সম্মুখে ভারতী গোসাঞি চর্ম্মের অম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিতেছেন, "কৈ, ভারতী-গোসাঞি কোথায়?" ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগে।" প্রভু বলিলেন, "ইনি কখনো ভারতী-গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারতী-গোসাঞি কেন চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন। কৃষ্ণ-ভজনে বাহ্য প্রতারণা নাই।" এই কথা শুনিয়া ভারতী তাড়াতাড়ি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। যেরূপ প্রভু ভারতী গোসাঞির চর্ম্মাম্বররূপ বাহ্য-প্রতারণা ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদাসের বাহ্য-প্রতারণা স্বরূপ যে মলিন-দেহ তাহা ঘুচাইলেন, ঘুচাইয়া দিব্য-দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য পবিত্র ও চিন্ময় দেহ পাইলেন; পাইয়া, অমনি প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুর পার্ষদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভুকে দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ পর্য্যন্ত শুনিতেন। যথা চরিতামৃতে—

"হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।"
"মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।"
"আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।"

ফল কথা, হরিদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে পাইলেন। স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান না, কেবল তাঁহার কণ্ঠ-সঙ্গীত শুনিতে পান। সুতরাং প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ-সমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার তাঁহাদিগকে দেখাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া আবার কৃপাপাত্র

করিয়াছেন, আর নিজের গায়করূপে-মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন—,"ছোট-হরিদাস আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভু তো ছোট-হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন, স্বয়ং প্রভুকে দামোদর পণ্ডিত যে দণ্ড করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ইহারা পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্করকে আমরা ভালরূপে জানি। শঙ্কর, প্রভুর শেষ লীলায়, তাঁহার পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভুর অতি-নিজজন; এমন কি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির করচা, (যাহার দ্বারা প্রধানত আমরা প্রভুর লীলা জানিতে পারি) দামোদরের লেখা। মুরারি ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করিয়া লেখেন। তাহার এক প্রধানগুণ যে, তিনি স্পষ্টবাদী॥ প্রভুকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট-কথা বলিতে ছাড়িতেন না। একটী উড়িয়া ব্রাহ্মণশিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভুর স্বভাব চিরদিন বালকের ন্যায়, কাজেই তিনি বালকের সঙ্গ বড় ভালবাসেন। সে আসিলে তাহার সঙ্গে দুই একটি মধুর কথা বলেন। বালক প্রভুর প্রীতিবাক্য পাইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হয় যে, অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না। কারণ বালকটি পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অল্পবয়স্কা। দামোদর চুপে-চুপে চোক পাকাইয়া বালকটিকে বলেন, তুই এখানে প্রত্যহ আসিস্ কেন? আর আসিস্ না।" কিন্তু সে বালক তাহা শুনিবে কেন? প্রভুর মাধুর্য্য ও মিষ্টিকথা তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করেন যে পিতা, তাহা তাহার নাই। কাজেই দামোদরের কথা না শুনিয়া সে আসিতে লাগিল। দামোদরের অন্তরে এইজন্য মহাকষ্ট, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না।

তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বালক উঠিয়া গেলেই প্রভুকে বলিতেছেন, "গোসাঞি! এই অবধি সমস্ত পুরুষোত্তমে তোমার যশ প্রচার হইবে।" প্রভু দেখেন যে, দামোদর রাগে গরগর। ইহা দেখিয়া সরল-প্রভু বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, তুমি রোষ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি নিষেধ কি? তবে জগৎ বড় মুখর। এই যে বালকটি উঠিয়া গেল, উহার চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কৃপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটি মহৎ দোষ আছে, যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও সুন্দরী। আর তোমার একটি দোষ যে, তুমি যুবা ও পরম সুন্দর। এরূপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর মনে মনে আপনার অপরাধ মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভু দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ সুহৃদ আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবদ্বীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন! তাঁহাদের রক্ষা কর্ত্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট দিতে পারেন। তখন সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী যাইয়া থাকিবেন। যখন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন। আর

যখন তাঁহারা দেশে ফিরিবেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। যাইবার সময় দামোদরের সহিত প্রভুর জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন, ও আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যখন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন। এইরূপে দামোদর দ্বারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। যখন দামোদর আসিতেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ই নিমাইয়ের আগমনের সুখ অনুভব করিতেন। তাঁহাদের অর্থ কড়ির প্রয়োজন ছিল না, বহুতর ভক্ত তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন—প্রসাদ, প্রসাদী-বস্ত্র ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদয় উপঢৌকন লইয়া আসিতেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়জনের মিলন-সুখ পাইতেন। শচী প্রায় প্রত্যহ দামোদরকে লইয়া বসিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতীও আড়ালে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথায় তাঁহাদের দিবানিশি সুখে যাইত। আবার দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া গেলে প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া বাড়ীব সমুদায় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নরলীলার মধ্যে সাংসারিক-লীলা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণ লইয়া বিব্রত, সকলে একসঙ্গে তাঁহার কোলে উঠিতে চাইতেছে। কেহ কান্দিতেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন। ইহা স্মরণ করিলে কাহার না বিস্ময় ও আনন্দ হয়? আমাদের প্রভুর স্ত্রী ও জননীর সহিত গোষ্ঠি করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণের বড় সুখকর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভুর লীলায় ছয়জন গোস্বামী। তাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব,—এই তিন-জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন কিরূপে গোস্বামী হইলেন, তাহা শুনুন। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আম্বুয়া পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে* তাঁহার বাস। তিনি বড় জমিদার, নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই, প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতামাতা অনেক যত্ন করিলেন, পুত্রকে অতি সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় বিষয়ে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, পলাইবার যো নাই। তবুও রঘুনাথ সুযোগ পাইয়া বারে-বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন! পরিশেষে একবার আর ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাঁটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া গোয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। পাছে ধরা পড়েন বলিয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একরূপ অনাহারে অরণ্য-পথে দৌড়াইতেছেন। বড় মানুষের ছেলে, পদতল শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে-ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ১৮ দিনের পথ ১২ দিনে আসিয়া উড়িষ্যাদেশে পৌঁছিলেন। পথে কেবল তিন দিন আহার জুটিয়াছিল। প্রভু বসিয়া

---

* এই কৃষ্ণপুর বর্ত্তমান হুগলীর নিকটবর্ত্তী।

আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।' রঘুনাথ বড় মানুষের ছেলে, তাঁহাকে সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর, রঘুনাথকে বড় কৃপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি জগতের যত সুখ ত্যাগ করিল, সে অবশ্য কৃপাপাত্র হইবার দাবী রাখে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে যে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী। রঘুনাথকে প্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তেরাও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখিলেন যে, সেই বড়মানুষের ছেলে অনাহারে অনিদ্রায়, পরিশ্রমে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। তখন কৃপার্ত্ত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ ! আমার এখানে পূর্ব্বে দুই রঘু ছিলেন এখন তিন রঘু হইলেন। এই রঘুকে তোমাকে দিলাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। আমি এই অবধি এই রঘুকে স্বরূপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হাত ধরিয়া স্বরূপের হাতে দিলেন, আর অমনি রঘু স্বরূপের চরণে পড়িলেন। তখন স্বরূপ "তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাত করিলেন। প্রভু, রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া এস,—গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে। রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, এবং প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন। এখানে প্রিয়দাসের "ভক্তমাল" গ্রন্থ হইতে

রঘুনাথের সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পথশ্রমে রঘুনাথের জ্বর হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জ্বর ত্যাগ হইলে ক্ষুধা হইয়াছে। জ্বরান্তে যেরূপ রোগীর হইয়া থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াছে,—একটু লোভও হইয়াছে। নানারূপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত মনে মনেও কিছু জিহ্বাগ্রে দিতে পারেন না। তাই সেই গভীর রজনীতে মনে মনে প্রভুকে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বসাইয়া, আকণ্ঠপুরিয়া খাওয়াইলেন। ইহা এক প্রকার সাধনা। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন! পরদিন মধ্যাহ্নে ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু স্বরূপকে বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার তাৎপর্য্য স্বরূপ অবশ্য বুঝিলেন না, পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি প্রভুকে অসময়ে বড় ভোগ দিয়াছ? প্রভু বলিতেছেন তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ তো অবাক্! তখন তিনি সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিব, কারণ ইঁহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইঁহার দ্বারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদূর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণও ভক্তি-বলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য কিরূপ শ্রবণ করুন। ১২ লক্ষের অধিকারী হইয়া তিনি নীলাচলে প্রভুর অতিথি। ৫ দিন প্রভুর প্রসাদ পাইবার পরে, উহা ছাড়িয়া দিলেন। তখন সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ-নাম জপ করেন। নিশিযোগে যখন জগন্নাথের দ্বার বন্ধ হয়, তখন যদি দ্বারে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন

তবে বিষয়ী লোক, কি জগন্নাথের সেবকগণ, তাঁহাকে আহার দেন। এইরূপে রঘুনাথ দ্বারে যাহা পান তাহা দ্বারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রঘুনাথের সমুদায় কার্য্য শ্রবণ করিতেছেন। যখন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়াছেন, তখন প্রভু একটী শ্লোক পড়িলেন, যথা, "অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি" ইত্যাদি; বলিলেন, "রঘু, বেশ করিয়াছ। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্যার আচার।" তাহার পরে, রঘুনাথ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানীদিগের প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় না হয়, তাহা পচিয়া গেলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরূপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যেটুকু মাজ-অন্ন পাওয়া যায়, তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন; শুনিয়া সেই অন্ন দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া, উহার এক গ্রাস মুখে দিলেন। আর একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও এ তোমার বড় অন্যায়।" প্রভু স্বরূপের কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় বস্তু খাও! এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখনো খাই নাই।"

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রঘুনাথ গৌরশূন্য নীলাচলে তিষ্ঠাতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিলেন। মনের ভাব ভৃগুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটিল না। কিছুকাল

পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাথের নিকট প্রভুর লীলাকথা শুনিয়া তিনি অন্তলীলার অনেকাংশ লিখেন। এই রঘুনাথের প্রতি-মুহূর্ত্তের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্ত্তনে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন!
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পন্দন॥"

এই বৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস বহুকাল জীবিত থাকেন। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ নব্বই, কেহ একশত, কেহবা একশত পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকেন। অদ্বৈতপ্রভু এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন, চলিতে পারেন না, তবু হামাগুড়ি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কখনো যমুনাপুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন, কখনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার শেষজীবন দর্শন করিয়া অনেক ভক্তও উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত আছেন, যথা—

"রাধে রাধে, তুমি কোথা লুকাইয়া আছ?

গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা-তটে, আবার ডাকে বংশীবটে,
রাধে রাধে ইত্যাদি”

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দাস গোস্বামীর এই যে এত কষ্টের জীবন, ইহাতে সুখ কোথায়? রাধাকৃষ্ণ ভজনের কি এই ফল? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্ত্তমান। কৈ তিনি তো এই কষ্টের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটী গেলেন না? কথা কি, কৃষ্ণ-বিরহে যে সুখ তাহা অন্তরে, বাহিরের লোকে তাহা কিরূপে বুঝিবে?

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেবল নূতন আসিয়াছেন, তখন এক দিন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর নিকটে একটী নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে কৃপা হয়॥” প্রভু বলিলেন, “আমি তোমাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, সুতরাং শারীরিক সুখ ত্যাগ কর। গ্রামকথা বলিও না, বা শুনিও না। দীন-ভাবে মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর। এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, ‘পুতুল পূজা কেন করিব। মনে মনেই পূজা করিব।’ কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাস গোস্বামী “মানসে” শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিতে প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। কারণ সে ভজনে তখনও তাঁহার অধিকার হয় নাই, কাজেই প্রভুর আজ্ঞা সত্বেও বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া, ক্রমে মানসে সেবা করিতে শিখিলেন, শেষে মানস-সেবাও ছাড়িয়া দিয়া বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সহিত লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন!

রঘুনাথের ন্যায়, ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী। তাঁহার পিতা শতানন্দ খান্ ধনবান লোক। কিন্তু শ্রীভগবান আচার্য্য সেই অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পাঠ করিয়া মহাপণ্ডিত হইলেন। তিনি আপন বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে আসিলেন। তখন প্রভুর সঙ্গীরা সকলেই যেমন জগৎ-বিজয়ী ভক্ত, তেমনি জগৎ-বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু প্রভু বাজে-কথা শুনেন না,—পাণ্ডিত্যে তাঁহার মন নাই। যদি ভক্তি-বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয়, তবে নিতান্ত অনুরোধে হয়তো তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নহে। যিনি যে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি এরূপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র থাকেন, তবে তিনি অগ্রে স্বরূপ গোস্বামীর কৃপাপাত্র হয়েন। স্বরূপ যদি দেখেন যে পুস্তক কি শ্লোক প্রভুকে শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রভুর নিকট তাহাকে লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাহার বিদ্যা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন॥ প্রভু, ভগবানের সম্বন্ধে তাহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান গোপালকে স্বরূপের কাছে লইয়া গেলেন। স্বরূপের সহিত তাঁহার অতি সখ্যভাব।

স্বরূপকে বলিতেছেন, "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাষ্য শুনা যাউক।"

তখন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়ে যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর করি মানে॥"

স্বরূপ বলিলেন, "ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি তাই শুনিব যে, "আমিও যে, কৃষ্ণও সে?" ভগবান আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমরা কৃষ্ণের দাস। আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্ত, বেদান্ত কি আমাদের মন ফিরাইতে পারে?" স্বরূপ বলিলেন, "তবুও বেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে। সমুদায় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মনুষ্যের চরম ফল, ইত্যাদি' কথা শুনিতে পারিব কিরূপে?" অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, এমন সময় আউলির বল্লভভট্ট আসিয়া উপস্থিত। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ইনি প্রভুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। অতি স্বাধীন-প্রকৃতি; এমন কি,

শ্রীধরস্বামীর টীকাকে দূষিতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় নাই। প্রভুকে প্রথম-দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভুকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন—ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। তখন হৃদয়ে যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভুকে ভট্ট-ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের একটি নিয়ম আছে যে, ঠাকুর-ঘরে যে সকল দ্রব্য থাকে তাহা ঠাকুর-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না, হইলে উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়,—সুতরাং ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন প্রভুতে ভট্টের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রব্যাদি দ্বারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভট্টের পূর্ব্বকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—ঈর্ষার সৃষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। "চৈতন্য" একজন বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারক, তিনিও তাহাই। অধিকন্তু তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, "চৈতন্য" তাহা করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, আর প্রভু সন্ন্যাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রভু, বল্লভভট্টকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অদ্য জগন্নাথ তাহা পূর্ণ করিলেন। তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কৃষ্ণনাম লওইয়াছ, প্রেমে ভাসাইয়াছ। এ সমুদায় কি কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত হইতে পারে?" এই যে ভট্ট বক্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটি কথাও অন্যায় নয়, কিন্তু তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে, তিনি বক্তৃতা-মাত্র করিতেছেন, আর

তাঁহার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ। সে যাহাহউক, প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি ভক্তির কি বুঝি? তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সৎসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক সঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্য। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আর একজন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ। রস কাহাকে বলে, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন স্বরূপদামোদর, তিনি মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিখিলাম। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম লয়েন।

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদায় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভু বলিলেন, "তাঁহাদিগকে এইখানেই পাইবেন। তাঁহারা রথোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন।" ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজদেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক পান নাই, তাই নীলাচলে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে ভক্তির সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ! তোমাকে বলিহারি যাই! দম্ভ এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী! মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্রব হইল না। কেবল তর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন,—এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন করেন; সেখানে শ্রীঅদ্বৈত, সার্ব্বভৌম স্বরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্ষদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভট্ট নানা বাজে-কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া, প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅদ্বৈত আপনি

তাঁহার কথার উত্তর দিতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভট্টের যে সমুদয় কথাবার্ত্তা, সে কস্তু, অর্থাৎ বলশূন্য কি পদার্থশূন্য। তাঁহার একটি প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে, তাঁহার কথা কিরূপ অসার। বলিতেছেন, "আমি দেখি, তোমরা সকলে কৃষ্ণনাম লও, আবার কৃষ্ণকে প্রাণপতি বল,—ইহা কিরূপে হয়? যে পতিব্রতা হয় তারাহার তো পতির নাম লইতে নাই?" এখন যাহারা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কি বিহ্বল, কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন?

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুর গণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসক। অর্থাৎ বল্লভ বাৎসল্য রসে, আর প্রভুর গণ মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। তাই, বল্লভ মধুর রসের ভজনাকে দুষিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরূপে?" যদি সেখানে ঐরূপ তার্কিক কেহ থাকিত, তবে সেও বলিতে পারিত, "আচ্ছা তুমি তো শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পুত্র বলিয়া ভজনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরূপে?" ভট্টের জ্বালায় প্রভু ও প্রভুর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "শ্রীধর-স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে, আমি সে সমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত-কথা,—এই শ্রীধর-স্বামীর নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে। শ্রীধরস্বামী না হইলে শ্রীভাগবত কেহ বুঝিতে পারিত না। সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, "আমি স্বামীকে মানি না।" এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অস্থির হইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভায় যাইয়া আস্ফালন করেন। প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভু কখনও কিছু

বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন। তাই যখন ভট্ট বলিলেন, "আমি স্বামীকে মানি না" তখন প্রভু বলিলেন, "স্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ হইল। ভট্ট অপ্রতিভ হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট রজনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সস্নেহে ব্যবহার করিতেন। এখানে আসিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন। এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে দূরে যায়। প্রভুর সভায় আমার কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু কৃপা করেন দেখিয়া, প্রভু তাঁহাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সুবুদ্ধি আসিল। তখন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবগণ এখানে দেখিলাম, ইহারা সকলেই আমা হইতে ভাল,—কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সে ধন হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা-জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভুর নিকটে যাইয়াই ভট্ট তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আর সরল ভাবে সকল কথা বলিলেন;—বলিলেন, "প্রভু, বুঝিয়াছি তুমি আমার পরমবন্ধু। তুমি আমার গর্ব্ব দেখিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া, উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত, আমাকে দণ্ড করিতেছ। পূর্ব্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ বোধ হইত। এখন বুঝিলাম যে, এ দণ্ড নয়,—তোমার মহাকৃপা।" প্রভু অমনি দ্রবীভূত হইয়া

বলিলেন, "তোমার দুইটি গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত, আর তুমি ভাগবত। যাহাদের এই দুই গুণ আছে, তাহাদের গর্ব্ব থাকিতে পারে না। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ,—গর্ব্ব ত্যাগ কর, তবেই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।"

ভট্ট তখন প্রভুর মুখ-পানে চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণয়াকুল নয়ন স্নেহভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে তখন বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতি প্রভুর আবার কৃপা হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না।" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তখনি মহা-সমারোহ করিয়া প্রভুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন,—নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোঁসাঞি। পণ্ডিত গোঁসাঞির ন্যায় নিরীহ ভালমানুষ জগতে আর কেহ নাই, হইবারও নয়। যখন ভট্ট প্রভুর গণের অপ্রিয় হইলেন, তখন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট শুনেন না। ভট্টের তখন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই তিনি গদাধরের নিকট যুগল-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিলেন। গদাধর বলিলেন, "আমার দ্বারা তাহা হইতে পারে না, কারণ আমি প্রভুর দাসানুদাস, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, তবে তুমি আমার এখানে আসিয়া থাক বলিয়া, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি প্রভুর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাধরের উপদেশেই ভট্টের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। এই কথার পরে ভট্ট প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। যেদিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সে

দিন গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভায় যাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ—এই তিন জনকে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন। পথে স্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে তুমি কেন প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না?" গদাধর বলিলেন, "প্রভুর সহিত শঠতা করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তর্যামী, আমি যদি নির্দ্দোষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা আপনি কৃপা করিবেন।" তাহার পরে সভায় যাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; তারপর বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে ক্রোধ কর না, কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে; তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন মতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।"

ইহার কিছুদিন পরে, প্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধরের নিকট ভট্ট যুগল-ভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্য শ্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের গুরু সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভজন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক-ভক্তের গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে পর্য্যন্ত, বড় প্রবল।

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধানার আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধার

হইয়া যাইবে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে, হরিদাসের দ্বারা প্রভু জীবের নিকট নামের মাহাত্ম্য প্রচার করেন॥ কিন্তু হরিদাস জীবকে আর একটি প্রধান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতা। হরিদাসের ন্যায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধুমহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্পর্শ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন। হরিদাস প্রভুদত্ত কুটীরে দিবানিশি বাস করেন এবং নাম জপ করেন। প্রভু প্রত্যহ সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া প্রত্যাগমনকালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কখন-বা পার্ষদ্‌গণ সহ হরিদাসের কুটীরে যাইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ যাইয়া দেখেন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাত্রোত্থান করিলেন, তারপর বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্ঘন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম-জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিয়া একটি অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি?" হরিদাস বলিলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মন অসুস্থ, কারণ আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সাধনে এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহাত্ম্য

প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার কৃপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, এরূপ করিয়া শরীরকে আর দুঃখ দিও না।"

তখন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু ও সব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটি বর দিতে হইবে। তুমি অবশ্য লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। সেটী আমাকে দেখিতে দিও না। দোহাই প্রভু, যাহাতে আমি শীঘ্র-শীঘ্র যাইতে পারি সেই অনুমতি কর।"

এই কথা শুনিয়া প্রভুর আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "হরিদাস, তুমি বল কি! তুমি ছাড়িয়া গেলে আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দ্দয় হইয়া তোমার সঙ্গ-সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও? তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আমার আর কে আছে?"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলে ভুলাইও না। কত কোটী মহান্-ব্যক্তি তোমার লীলার সহায় আছে। আমি ক্ষুদ্র-কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অন্যায় কথা তুমি কেন বল? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস প্রভুর পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতেছেন, "আমার স্পর্দ্ধার কথা শুনুন। আমি যাইব,—তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া, তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে-দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে-করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে?"

যেমন অল্প-মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে, সেইরূপ দুঃখে প্রভুর শ্রীবদন অন্ধকার হইয়া গেল, উত্তর করিতে পারিলেন না;—অনেকক্ষণ মলিন-বদনে ও অবনত-মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর, কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; তবে আমি তোমা-বিহনে কি-কষ্টে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্ষ-চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে প্রভু স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন, "হরিদাস, সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক।" হরিদাস বুঝিয়াছেন যে, প্রভু তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইহাই বলিতে-বলিতে হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভুর ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস দুর্ব্বল হইয়াছেন, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেড়িয়া সকলে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন,—কেন, না মরিবার জন্য! ভক্তগণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস সুবিধা মত তাঁহাদের পদধূলী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। এইরূপে হরিদাস পদধূলীতে ধূসরিত হইলেন। নৃত্য করিতেছেন স্বরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বয়ং প্রভু, স্বরূপ, রামরায়, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অদ্য বক্তা স্বয়ং প্রভু, আর বর্ণনীয় বিষয় হরিদাসের গুণ। ভক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে-করিতে বিহ্বল হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তখন ধীরে-ধীরে সেখানে শয়ন করিলেন। তাঁহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ ভক্ত-পদধূলায় ভূষিত। আর মুখে বলিতেছেন, "দয়াময় প্রভু! শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান দিও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি বসিলেন। আর হরিদাস অমনি প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। প্রভু আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া সুধাপান

করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমধারা পড়িতে লাগিল। তখন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর, (যথা চৈতন্যচরিতামৃত)

"নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

দুই দিবস পূর্ব্বে হরিদাসের সামান্য কিছু অসুখ হইয়াছিল, তাহার পরদিন তিনি প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, আর তৃতীয় দিনের দিন আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে চিরদিনের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন! হরিদাস যে যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনেও ভাবেন নাই। হরিদাসের অসুখ হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদাসের সহিত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখনি জানিলেন, যখন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণনাকালে বলিলেন যে, "হরিদাস যাইতে চাহিলেন, আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া গোলকে যাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন, আর কৃষ্ণ তাহাই করিলেন।" ভক্তগণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন যখন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভু তখন হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইলেন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ কেন? না, হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। তখন ভক্তগণও প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই,—ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার। আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন, যাঁহার ত্রিজগতে

কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই? তাঁহার নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের স্থায় স্নেহ করেন। সকল স্ত্রীলোকই তাঁহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অর্থাৎ অন্তের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার, —তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। যেমন ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার হরিদাস। হরিদাস যেমন ভক্ত, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও সেইরূপ! প্রভু বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ তাঁহাকে অন্তেষ্টিক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপর হরিদাসের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে, আর সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। সমুদ্রতীরে যাইয়া মৃতদেহ নামাইয়া স্নান করান হইল। প্রভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল। তখন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি খনন করিলেন। তৎপরে হরিদাসের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে—

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দ নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়॥"

তৎপরে কবর বালুদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইল। তখন আবার নর্ত্তন ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শেষে সকলে ঝাঁপ দিয়া আনন্দে হরিধ্বনির সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন, কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। যেখানে পসারীগণ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছে, প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন; বলিলেন, "আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত ভিক্ষা দাও।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পসারীগণ সকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। স্বরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন "আপনি বাসায় চলুন, আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত বাসায় গমন করিলেন। স্বরূপ চারিজন বৈষ্ণব রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক একটী দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটী বোঝা করিয়া তিনি বাসায় আসিলেন।

এদিকে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়া নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাচলে মুসলমানের আসিতে নিষেধ। যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস রোদন করিয়া বলিলেন যে, কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেতু তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—'আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।" আজ সেই হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে বাল বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলে

আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি, ভক্তি জাতির উপরে, সকলের উপরে।

স্বরূপ গোঁসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ পাইতে নগর সমেত লোকের সাধ হইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র,—যিনি মন্দিরের কর্ত্তা।

বৈষ্ণবগণকে প্রভু সারি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া নিজে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক পাত্রে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥"

স্বরূপ, প্রভুকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন; করিয়া, তিনি স্বয়ং, আর বলবান কাশীশ্বর, জগন্নাথ ও শঙ্করকে লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না, কিন্তু সে দিবস কাশীমিশ্রের বাটীতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের অতি অল্প পূর্ব্বেও প্রভু ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না যে, হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন। কাশীমিশ্র প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী সেখানে লইয়া আসিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীগণ লইয়া বসিলেন, আর যত্ন করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,—প্রভুর যেন এ নিজের কাজ, যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ!

ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্যচন্দন পরাইলেন। তার পরে বলিতেছেন—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণ প্রেম-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রমণ।
পূর্ব্বে যেই শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা সেই করিলা প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥"

প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্তুতঃ হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে প্রভুর প্রাত্যহিক একটি সুখের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রত্যহ সমুদ্র-স্নানের পর হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল

না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইল। হরিদাসের অন্তর্দ্ধান তাহার প্রথম লক্ষণ।

লোকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মনুষ্য যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে তো অসুর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘৃণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা সন্তানকে স্নেহ করা, পিতামাতাকে কি শ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি করা, —এ সমুদায় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া-শূন্য যে মনুষ্য—সে অসুর, রাক্ষস, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ, ইত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান তিনি মায়াময়, আমরা কিরূপে ও কেন মায়া ত্যাগ করিব? কৃষ্ণের চক্ষে কথায়-কথায় জল, শ্রীকৃষ্ণ দীনদয়ার্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে-কাতর, প্রেমে-পাগল,—তবে মনুষ্য কিরূপে মায়ামোহশূন্য হইবে? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগৌরাঙ্গ প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, ইঁহারা সকলে মিলিয়া এক বৃহৎ পরিবার-স্বরূপ বাস করিতেছেন। এই পরিবারের মধ্যে গৃহী আছেন,—যেমন রামানন্দ; সন্ন্যাসী আছেন,—যেমন পুরী, ভারতী; উদাসীন আছেন,—যেমন হরিদাস। হরিদাস যখন অন্তর্দ্ধান করিলেন, সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে, এমন কি প্রভু পর্য্যন্ত, অনুভব করিতে লাগিলেন। "এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব?" হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা!

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কারণ নাই। ঠাকুর মহাশয়, রসিকানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও

আশ্চর্য্যরূপে অকপট হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তি-চর্চ্চার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় দেশ ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত জীবাত্মারূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া, তাহার পরমাত্মারূপ পতির সহিত মিলন সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যতই সাধনা করেন, ততই তাঁহার শরীররূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে। তাহার পর ভক্তের এরূপ একটি অবস্থা হয় যে, তাঁহার শরীরের সহিত জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি-জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন জীব,—ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন,—আপনার শরীর হইতে অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিষ্ক্রামণ করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ অধিকারী-জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন। হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ; তাই ভাবিলেন যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। তখন প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু দেখিলেন যে, হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুখ্রীষ্ট যে অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে রক্তপিপাসু জাতি সমুদায় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। এই যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যখন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম, তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় হইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ দেখাইবার কিছু নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চিরদিন লজ্জা দিয়া আসিতেছেন ; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরূপ মহত্ত্ব কোথায়, কোনও কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না।" আমরা

মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন না, আমরা তখন প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—এদেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে ; আর নবশাখগণ প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহারা বিদ্যাচর্চ্চা করিত না। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবগোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই, সে কথার উত্তর আমরা কি দিব ? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের প্রভুর অপরিসীম কৃপায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন অনেকের চরণে তাহার শরণাগত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলাকথা আছে সেখানে নয়, যেখানে যেখানে তত্ত্বকথা আছে সেখানে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে, অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছেন, ইহা প্রায় কেহই জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে, যীশু যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও অধিক মহত্ত্ব দেখান। যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জ্জনা কর।" আর হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!" আমার নিতাইয়ের মস্তক দিয়া রুধির পড়িতেছে, আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সমুদায় কেবল গৌরাঙ্গ-লীলায় পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নাই।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন-ভজনে, অনেক বাহ্যক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোক হাস্য করেন ও আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত অন্য জাতির বিবাহ হইবে না। শুধু তাহা নয়, এক জাতির দুই শ্রেণী আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইবে না। দেখুন, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে না। ইহার ফলে হিন্দুকুল নির্ম্মূল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে জাতি, কি বিদ্যা, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড় বিচার নহে,—ইহা কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ পান করিলেন। ইহা সামাজিক নিয়মের ঘোর বিরোধী কার্য্য। কিন্তু প্রভুর ধর্ম্মে এ সমস্ত বাহ্যক্রিয়া কিছু নাই। আবার হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহার দেহ দাহ না করিয়া কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে এই সমুদায় ছাই মাটীর কথা লইয়া কচকচি নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তখন উহা ভস্মসাৎ কর কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বুদ্ধিমান্ পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদায় অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত্ত হিন্দু-সমাজে একতা নাই, আর উহা ছারে খারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ প্রভুর বামবাহু—বিশাখার অবতার, বাণীনাথ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয়কার্য্য করেন। ইহাদিগের দুইজন,—রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইহাদিগকে অধিকারীও বলে, রাজাও বলে। ইঁহারা রাজার যে কার্য্য তাহাই করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রাজা

যদি অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মাল-জ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহাজনের লক্ষ কাহন পাওনা হয়। গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু-লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনার টাকা দিতে পারেন না। সেই ঋণ-শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না, তবে এত কম মূল্য কেন বল?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিন ঐরূপ ঘাড় ফিরাইতেন। কাজেই গোপীনাথের কথায় তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র। সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়্গ পাতিয়া উপরে অপরাধীকে রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইয়া বলিল, "প্রভু রামানন্দের গোষ্ঠী তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র-সংত্র্যাতা"। প্রভু একটি কথা বলিলে গোপী নাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্তব্য, যেহেতু ভবানন্দ গোষ্ঠীসমেত তাঁহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না; বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারে। তাহা না করিয়া সে চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্য্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সেত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভু এই কথা বলিতেছেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোষ্ঠী-সমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে, কথাটী অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন এমন কি, স্বরূপ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "প্রভু রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে। কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করে। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বিষয়কার্য্যে গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সময় শুনিলে রাজ্য-শাসন চলে না। আবার কাশীমিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন? তবে তখন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, যাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না।

তিনি আমাদিগের প্রভু। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। ভবানন্দ-পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। কিন্তু যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব? তোমারা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাতিয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি? আচ্ছা তাহাই না হয় করিলাম; কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসী আমাকে দুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা কেন দিবেন?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিতেছে। এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ বধ্যস্থল হইতে আসিল। প্রভু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্য্যন্ত তিনি বিফলে কাটাইয়াছেন। তখন জগতের সমুদায় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওনা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রও বটে।

এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সে কি ! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয় এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তখন কাশীমিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন ? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতারুদ্রের মুখ শুখাইয়া গেল ; বলিতেছেন, "সে কি ? সব খুলিয়া বল।" তখন কাশীমিশ্র বলিলেন, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয়-কথা কেন ?' রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশীমিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন. বলিলেন, যে ব্যক্তি রাজার দ্রব্য অপহরণ করে সে দণ্ডার্হ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয়-কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এ স্থান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর সংবাদ ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচিব ? আমি গোপীনাথের সমুদায় ঋণ মাপ করিলাম।"

তখন কাশীমিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্জ্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার

এইরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ভিন্ন সুখী হইবেন না।” রাজা বলিলেন, “তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না। কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠীকে আমি নিজজন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর, তাহারা গোষ্ঠীসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। সে যে, অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধহয় তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।”

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতধটী অর্থাৎ অধিকারী সাজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর লীলার মধ্যে এই একটী মাত্র বিষয়-কথা আছে! তবু ইহাতে কয়েকটী মহা-উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটী কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণ বাঁচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার পক্ষে রাজার নিকট অনুরোধ করা কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটী হইত। যখন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু বলিলেন যে তাঁহারা যদি গোপীনাথের নিমিত্ত প্রাণভিক্ষা চাহেন, তবে তাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের প্রথম খণ্ডে “আমি ও গৌরাঙ্গ” শীর্ষক কবিতায় এই পদটি আছে :—“(জীব) বিপদে পড়িলে স্বভাব জিয়াছ সহজে তোমারে ডাকে।”

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট দুঃখ পাইয়া আর্ত্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবানুসারে তোমারে ডাকিয়া থাকে।"

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? যাঁহারা বিশুদ্ধ-ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি মস্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিকট লইয়া যান। ইহাই যখন ভক্তের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, তখন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও, তবে শ্রীজগন্নাথের নিকটে প্রার্থনা কর? কথা এই, ভক্ত দুই প্রকার আছেন। কেহ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীবাস। তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে। সামান্য বিপদে পড়িলে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু গুরুতর রকমের বিপদ হইলে, তখন আর তাহা পারে না;—তখন বলিয়া উঠে "হে ভগবান রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, যাহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, এ কথা বলি কেন,—না প্রকৃতপক্ষে ইহারাও ভগবানে নির্ভরতা হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই নাস্তিকগণও বিপৎকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি তুমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

স্বভাবের ভুল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানুষের বিপদে এই কয়েকটী অতি নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তখন এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান্ আছেন, (২) তিনি সুহৃৎ, ও (৩) তিনি জীবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোষ্ঠি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না; তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, তাই প্রভু বলিলেন,—"শ্রীজগন্নাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাখণ্ড-লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন তখন তিনি মধ্য-নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। ইহাতে গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। জীব যখন ভবসাগর পার হয়, তখন শ্রীভগবান্ নৌকা দোলাইয়া থাকেন। ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহার উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়; বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রভুর কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সন্তানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায়, সে সমুদায় মায়া; পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা। দেখুন, শ্রীভগবান আমাদের কি রকম নিঃস্বার্থ বন্ধু!

ষষ্ঠ অধ্যায়

জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ। শিবানন্দ সেন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। প্রাণটি একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত এক তিল বাঁচেন না। বুদ্ধি তত প্রখর নহে। কিন্তু অন্তরটী অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর

আজ্ঞায় শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটী সংকল্প স্থির করিয়াছেন। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাহা জগদানন্দ দর্শন করেন, আর তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাই মনে ভাবিলেন, যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হস্তে প্রভুর মস্তকে উহা মাখাইবেন। মস্তিষ্ক শীতল হইলে অন্তরও শীতল হইবে, প্রভুও আর ঐরূপ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিবেন না। এইরূপ যুক্তি করিয়া, এক কলস অতি উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটী লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচনাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অগ্রে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে-চুপে তৈলের কলস গোবিন্দের নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা রাখিয়া দাও, প্রভুকে মাখাইব।"

গোবিন্দ বুঝিলেন যে, জগদানন্দের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কখনও ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অনুরোধে তিনি অতি নম্র ভাবে প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বায়ু ও পিত্ত উভয়ই শান্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি উহা মস্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই, বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈলে। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জ্বলিবে, তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অনুরোধ করিলেন, প্রভু তবুও শুনিলেন না।

কিছুদিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিন্দের শরণ লইলেন।

বলিলেন, "তুমি আবার প্রভুকে বল।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় দুঃখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বহুদূর হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হইল ভাল, সুগন্ধি তৈল আসিয়াছে, এখন তৈল মাখাইবার জন্য একজন ভৃত্য রাখ, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি সুগন্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী ইহা মাখিতে পারি না। জগন্নাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপে জ্বলিবে, তোমার শ্রমও সফল হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?" আর সে যে মিথ্যা কথা ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সম্মুখে বলপূর্ব্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন করিলেন; তাহার পর, দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, এবং দ্বারে খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

জীব মাত্রই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুঝ পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব।" জনক সন্তানের মঙ্গল নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাদুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না; তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানন্দের এইরূপে দুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাতে জগদানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ, শীঘ্র উঠ। আমি দর্শনে গেলাম, এখানে আসিয়া মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিব।" জগদানন্দের অমনি সমুদায় রাগ গেল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিক্ষার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। যেখানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একখানি কলার পাতা পাতিয়া তাহাতে অন্ন রাখিলেন, ও তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া দিলেন; কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা পুরিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিলেন। শেষে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আর একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় একত্রে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

তখন জগদানন্দের সমুদায় রাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে; গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু আপনি প্রসাদ লউন, আমি পরে বসিব।" প্রভু তাহাই করিলেন। মুখে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, "রাগ করিয়া রান্ধিলে কি এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়? না, কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা না হইলে অন্নব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদ কিরূপে হইল? জগদানন্দের মুখে তখন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।" এ দিকে যখন যে ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, অমনি জগদানন্দ সেই ব্যঞ্জন আনিয়া দোনা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন, পাছে জগদানন্দ আবার রাগ করেন। মধ্যে মধ্যে

ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না।" কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলেই ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলেই অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভু কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি তাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে ক্ষমা দাও।" তখন জগদানন্দ নিরস্ত হইলেন। ইহাকেই বলে শ্রীভগবানকে জব্দ করিয়া বাধ্য করা। এরূপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানন্দ রাগ করিয়া প্রভুকে জব্দ করিলেন না, করিতে পারিতেনও না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি বসিয়া দেখি।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, আপনি যাইয়া আরাম করুন, আমি এখনই বসিব। তবে যাহারা আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছি ; তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে যান। কিন্তু নানা কারণে প্রভুর তাহাতে মত নাই। প্রথমতঃ জগদানন্দ সরল, ভাল মানুষ, পথে মারা যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ সকলেই জানে তিনি প্রভুর পার্ষদ। হয়ত, কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিবেন। তাই, যখনই জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি চাহেন তখনই প্রভু বলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করে দেশান্তরী হইবে, আমি কি করে অনুমতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা কিসে প্রভুকে আরামে রাখেন। কিন্তু প্রভু সে সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না, কাজেই সর্ব্বদাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ বাঁধে, আর জগদানন্দের বৃন্দাবনে যাওয়া হয় না।

জগদানন্দ তখন স্বরূপের আশ্রয় লইলেন। স্বরূপ প্রভুকে বলিলেন

ও সম্মত করাইলেন। তখন প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকিও না। কাশী পর্য্যন্ত কোন ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌড়ীয়া পাইলে দস্যুগণ অত্যাচার করে, সুতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যাইবে। বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও কোথায় যাইবে না। সেখানে যে সমুদয় সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে; আর সনাতনকে বলিবে, আমিও সত্বর বৃন্দাবনে যাইতেছি।" কিন্তু প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, সুতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়াছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, নয় কি বলিতে কি বলিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, জগদানন্দ সেই বনপথে কাশী যাইয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে বরাবর বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভুকে পাইয়াছেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আর আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ দুই জনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একখানা রাঙ্গা বহির্বাস বান্ধা দেখিয়া জগাই ভাবিলেন, সেখানি অবশ্য প্রভুদত্ত, তাই গদগদ হইয়া সেই বহুমূল্য সামগ্রীটী একদৃষ্টে দর্শন করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি প্রভু তোমায় কবে দিলেন?" সনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখানি প্রভু-দত্ত ধন নহে; এখানি মুকুন্দ সরস্বতী আমাকে দিয়াছেন।" তখন জগদানন্দ যে হাঁড়িতে

পাক চড়াইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চাহিলেন। ইহা দেখিয়া সনাতন মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, “পণ্ডিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ আর কখন করিব না।” সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল। তিনি লজ্জা পাইয়া আবার চুলায় হাঁড়ি রাখিয়া বলিতেছেন, “গোসাঞি, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার ন্যায় তাঁহার প্রিয় আর কয়জন আছে? তুমি কিনা অন্য এক সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে বান্ধ!” সনাতন হাসিয়া বলিলেন, “আমরা দূরদেশে থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাঙ্গপ্রেমের কথা শুনি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জন্য মাথায় অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র বান্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধন্য তুমি জগদানন্দ!“ প্রকৃতই, জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর মান্য দ্বিজোত্তম সনাতনকে (যিনি তাহার আমন্ত্রিত) মারিতে উদ্যত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। সনাতনের কথা শুনিয়া জগাই কান্দিয়া উঠিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া গুণময় প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচর্চ্চায় জীবগণকে অর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মাধুর্য্য রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। চারিজনের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যথা, সনাতন, রূপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন রঘুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্ক শিশু অধ্যাপকের আজ্ঞায় দেশত্যাগ করিয়া, সস্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করেন। প্রভু, তপনকে বলিয়াছিলেন যে পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তপনমিশ্র কেন যে ঐ বালক-অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারানসীতে গমন করেন, তাহার কারণ গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক-অধ্যাপক আর কেহ নয়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জানি যে, তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃন্দাবন ও কাশী এই দুইই ভারতের প্রধান স্থান। বৃন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন?

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতামাতার প্রণাম জানাইলেন।

প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান ও বৃদ্ধ; পিতামাতার সেবা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। সেইজন্ত প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন না; বলিলেন, "কাশী যাইয়া পিতামাতার সেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধান হইলে আবার আসিও।" প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্যাধ্যয়ন কর এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটি আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রভু যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাসীন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে; তবে সে যে কি তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলেন না।

অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতামাতার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কখন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাক করিতে বড় সুনিপুণ। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল। তখন জীববন্ধু প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ বৃন্দাবনে তাঁহার প্রয়োজন। তাই বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গমন

কর, সেখানে সনাতন ও রূপের আশ্রয়ে বাস করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয়? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদায় কার্য্যে বুঝা যায়। প্রভু মহোৎসবে চৌদ্দহাত লম্বা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই দুই দ্রব্য চিরদিন নিকটে রাখিয়া ছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া সেখানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটি প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ-সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা কৃষ্ণের, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথের, আর ভাব সুর ও সঙ্গীত শ্রীল মহাপ্রভু দ্বারা সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরূপ বৃন্দাবনে তিন গোসাঞী বিরাজ করিতে লাগিলেন—যথা, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট, তাহার পরে রঘুনাথ দাস এবং সর্ব্বশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীর, অটল, শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের অবসর পর্য্যন্ত নাই। বাস, হয় কুটীরে, না হয় বৃক্ষতলায় কি গোফায়। গোফা কি না, একটী গর্ত্ত। ভল্লুকের গোফা আছে, তাহাতে ভল্লুক বাস

করে। সেইরূপ ভক্তগণ, যেখানে মৃত্তিকার স্তম্ভ আছে, তাহাতে গহ্বর করিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কাস্থাকরঙ্গধারী তাঁহাদের আর কোন সম্পত্তি নাই। বৃন্দাবন জঙ্গলময়, সেখানে অল্প সংখ্যক অসভ্য লোকের আর হিংস্রজন্তুর বাস। সেখানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দায়। রূপ সনাতন প্রভৃতির নিজেদের, আর যাঁহারা যখন আসিতেছেন তাঁহাদিগের, আহার্য্য-দ্রব্য ইঁহাদিগের সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাস্ত্রপ্রচার করা। শাস্ত্র কি না ভক্তিশাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ন্যায় সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই। এ শাস্ত্র তখন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এখানে ওখানে ভক্তির মাহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কূটার্থ দ্বারা অন্যরূপ বুঝাইতেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগবত পর্য্যন্ত, পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীকৃষ্ণ মায়া ; তিনিও যেই, আমিও সেই ; মরিলে আবার জন্মিতে হয় ; মোক্ষ অর্থাৎ নাশ, জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার যাঁহারা অল্প-স্বল্প মানেন তাঁহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজান, মদ্য-মাংস-রুধির দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন ? হয় শত্রুদমনের কি পুত্রলাভের নিমিত্ত, অথবা ধন ও যশ প্রার্থনা করিয়া। যাঁহারা ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষস ও পিশাচ ? শ্রীভগবান্ কি তাহাদিগের হইতেও মন্দ ? তাঁহারা নিজে কি রুধির পান করিতে পারেন ? কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন, না হয় গাঁজা খাওয়াইতেছেন ! যদি শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্দর্য্যময় নয় কেন ? সকল বিষয়ে তিনি পুরুষোত্তম—জ্ঞানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে

পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদায় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য্যও একটি শুভ; তবে তিনি কেন সৌন্দর্য্যের আকর না হইবেন? অতএব শ্রীভগবান যেমন গুণে ভুবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভুবনমোহন।

এইরূপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান লোকে কিছু মানেন না। আবার যাঁহারা কিছু মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে দৈত্য, অসুর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরূপ যখন সমাজের অবস্থা, তখন প্রভুর নিয়োজিত গোস্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান পৃথক বস্তু, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করে,—এই সমুদায় তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেহ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটী তণ্ডুলও নাই; রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে আশ্রয় নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ দ্রব্য—গ্রন্থ। এইরূপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্যচরিতামৃত" লিখিলেন, তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের একবৎসর লাগে। লিখিতে হইবে এইরূপ এক সহস্র গ্রন্থ। হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি তন্নতন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া, মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বুঝিয়া দেখুন গোস্বামীদিগের কার্য্য কতদূর কঠিন ও গুরুতর।

বৃন্দাবন জঙ্গলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারেখারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুহুর্মুহু নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কুস্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি ও মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য হইয়া থাকে। কাজেই সে দিক হইতেও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিগণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রণাম করেন, অমনি তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ, অপ্রতিভ, অপদস্ত কি অনাদর করিতে জানেন না। গোস্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন সময় একজন পণ্ডিত আসিলেন এবং অসার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। কোন গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় উঠিল, অমনি গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামিগণ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক-একখানি গ্রন্থ এক-একখানি বহুমূল্য রত্ন। ইহা কি শ্রীভগবানের শক্তি ভিন্ন হইতে পারে ?

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সুযশঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোস্বামীদিগের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক হইতে সাধু, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ গোস্বামীদিগকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আসিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজগণ এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি দিল্লীর বাদশাহ আকবর, কুতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত, রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে আসিলেন। যখন সনাতনের সম্মুখে আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন

গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদসাহ আসিলে মস্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আবার বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর, মহাশয় লোক, তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন বাক্য বই নয়, ইহা বুঝিয়া সনাতন অগত্যা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করিতে চাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই॥ কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তখন (যথা ভক্তমাল গ্রন্থে)—

একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে। তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়। ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থল হয়॥
এই স্থানটুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ। তব স্থানে মুঞি আর কিছু নাহি চাহ॥"

আকবর তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভৃত্যগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিলেন। এমন সময় বাদসাহের বাহ্যদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতের উদয় হইল। তখন—
"দেখে নানা মণিমুক্তা পরম রতন। মনোহর অলৌকিক পরম মোহন॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।" আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকুল অমূল্য রত্নে খচিত। তখন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন,—"এবে বুঝিলাম তুমি এই ত্রিজগতে মহা আঢ্য, ধনিগণ নাই তোমা হ'তে।"

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, সুতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীর একজন

হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া-মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন শুনুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যখন পূজা করেন তখন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশ্য ঐ কাহিনী শুনিয়া সম্রাট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহুজনের মুখে শুনলেন শেষে কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসহ মন্দিরের বাহিরে নিজজন সহ দাঁড়াইলেন। দেখেন গোসাঞী তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া আরতি করিতেছেন, আর শত-শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করা ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বামিঠাকুরের গোচর হইয়াছে। গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না। তিনি যে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহাতেই সে অপরাধ ক্ষালন হইয়াছে। পাতসাহ তখন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্যামী।" তখন পাতসাহ বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান কেবল তাঁহাদের নন। তিনি তাঁহারি, যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমান সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দু একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু কেহ বা বহু চেলা কি বহুজন সহ আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটীরের প্রয়োজন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহার পর দুই একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে বড় বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃন্দাবন একটি প্রকাণ্ড সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, দুই চারিটী কন্থা-করঙ্কধারী গৌরাঙ্গ-ভক্ত! তাঁহারা কি জঙ্গল কাটিতেন? না। তাঁহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্য্য করিতেন? না। তাঁহারা কি ধন দ্বারা মনুষ্য বশ করিতেন? না,—তাঁহাদের কপর্দ্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজজন কেহ ছিল? না—তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন্ শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন? তাঁহাদের শক্তি কেবল প্রভুর কৃপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তখন তিন মাসের পথ দূরে, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন!

রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ, ভাবুক, প্রেমে পাগল। যিনি তাঁহার ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রঘুনাথ ভট্টের দুইটি প্রধান কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ।* অনেকের মনে বিশ্বাস,

---

*কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ভণিতায় লিখিয়াছেন :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

আমাদেরও ছিল, যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস। তাঁহার আর একটী কীর্ত্তি গোবিন্দদেবের মন্দির। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন :—

রূপ গোসাঞীর সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর-কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হয় কিছু নাহি জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥

রঘুনাথের এ শিষ্যটী কে? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন এবং যিনি আকবরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পদস্থ, কি হিন্দু কি মুসলমান, আর কেহ ছিলেন না।

গোস্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের কথা বর্ণনা করিয়াছেন্ তাঁহারাই করুন। নিম্নলিখিত এই প্রাচীন পদ কয়েকটী পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় কতক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদায় পদকর্ত্তা, গোস্বামীগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে, বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
"রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি, মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্মদোষ-ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বেন্ধে, রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণা পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে চরণ নিকটে লহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল, সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে, এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে, অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে, তোমা বিনা নাহি হেন আর॥"
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনাতনে, পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে, পত্রী পড়ি করিলা গোপন॥

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞী, পাতশার উজীর হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা॥
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি, পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি, বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে,"মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পৃশ্য পামর হীন, দুরাচার মতি হীন, নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে, যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার॥"

ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়, লজ্জিত হইল সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কান্থা লৈয়া, প্রভু স্থানে পুন আগমন।
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী, শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে, কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা, পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস॥
গিয়া গোসাঞী সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদে ধরে, কহে রূপ গদ্‌গদ্ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন, হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে, এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে, এইরূপে থাকে কতদিন॥
কতদিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা, চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে, অবসর নাহি এক তিলে॥
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস, এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ, কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। যো দুঁহু প্রেম-ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজনক লাগি। শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥
অনুখণ গৌরচন্দ্র গুণগান। ভরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কতিহু না হেরিয়ে ঐছে উদাস। মনোহর সতত চরণে করু আশ॥

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী।

রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ধ্রু॥

চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণসী ছিল যার বাস।

নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ সেবিলা দুই মাস।

শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি করিলেন পিতার সেবনে।

তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে॥

মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।

প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন-ভূমি, মিলিলেন রূপ সনাতন॥

দুই গোঁসাঞী তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।

অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কৃষ্ণ—কথার উল্লাসে॥

সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে রঙ্গে, একত্র হইয়া প্রেমসুখে॥

শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত সমান গাথা, নিরবধি শুনে যার মুখে॥

পরম বৈরাগ্য-সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা, সুস্বর অমৃতময় বাণী।

পশু পক্ষী পুলকীত, যার মুখে কথামৃত, শুনিতে পাষাণ হয় পানী॥

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন, শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।

এ রাধাবল্লভ বোলে, পুড়িলুঁ বিষম ভোলে, কৃপা করি কর আত্মসাথ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিলা।

দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ, মল প্রায় সকল ত্যজিলা॥

পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।

এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস, নয়ন গোচর কবে হবে॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া, গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে।

ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিল তাঁহারে॥

চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ি করে, বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।

দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে দুই গোসাঞী তাহারে দেখিলা

ধরি রূপ সনাতন, রাখিলা তাঁর জীবন, দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া, বাস করি নিয়ম করিলা।
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান, অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি, রাধা-পদ ভজন যাঁহার॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে, স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে, স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে, ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত, অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি, প্রভুর করুণা হবে কবে॥
"হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব, রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ-দামোদর, কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন, অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি, এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দল, সবারে করয়ে পরণাম॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে, শুখরুখ অন্নমাত্র সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে, ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে, রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ, উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে।
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু, হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥

কান্দে গোঁসাঞী রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু মনে, ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধূসর
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহ ভার, বিরহে হইল জর জর ॥
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ, প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥

অষ্টম অধ্যায়

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। তিনি ধনবান্ ব্যক্তি, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বাটীতেই প্রথমে আড্ডা করেন। যখন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্তু তিনি অনেক মিনতি করিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন মানসে পাণিহাটী আসিলেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন; পরে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন করাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, ও মহা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দেশময় এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সবারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনি প্রসাদ পাইবেন। যিনি যাহা আনিবেন, তাহাই ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দধি, খই, মিষ্টান্ন, আম্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি ভারে-ভারে আসিতে

লাগিল। আষাঢ় মাস আরম্ভ, সুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটী অতি মনোহর; গঙ্গার ধারে বটবৃক্ষচ্ছায়ায় ভক্তগণ বসিলেন। যিনি যাহা বিক্রয় করিতে আনিতেছেন, তাহাই ক্রয় করিয়া তৎদ্বারা তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যস্থলে দুইখানি পাতা পড়িল,—একখানি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য, অপরখানি নিতাইয়ের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তখন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইয়ের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তখন সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। লোকে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কৃতকৃতার্থ হইলেন। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রতি-বৎসর চিড়া-মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাঘবের বিধবা-ভগ্নী দময়ন্তী অতি শুদ্ধা, পবিত্রা ও মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাঘবের ঝালী" প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, সুতরাং হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্তগণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর দূরের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যান। কেবল শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাত্রেই পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু দময়ন্তীর সেবা অন্য প্রকার। প্রভু সারা বৎসর ভোগ করিবেন, এইরূপ দ্রব্য তিনি প্রস্তুত করেন। ইহা করিতে বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সত্বর পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত করেন যাহা সত্বর নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সমুদায় স্থায়ী স্বাদু দ্রব্য দিয়া ঝালী সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হস্তে ন্যাস্ত করা হয়। যখন যখন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন।

ঝালী মুটিয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন। ইহাই "রাঘবের ঝালী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীচরিতামৃতে ঝালীর দ্রব্য এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

আম্র-কাসন্দি আদা-কাসন্দি ঝাল-কাসন্দি আর
নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ প্রকার॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা। যত্ন করি দিল গুণ্ডা পুরাণ শুকতা॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। শুক্তায় যে সুখ তাহা নহে পঞ্চামৃতে
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়। শুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
ধনিয়া মৌরীর তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া। লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত-হর। পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর॥
কলিশুণ্ঠি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর। কত নাম লব, আর শত প্রকার আচার॥
নারিকেল-খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকাচুটি ধান্যের আতপচিড়া করি। নূতন বস্ত্রের বড় কুথলীতে ভরি॥
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে লাড়ু কৈলা
কর্পূরাদি দিয়া॥
শালিতণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া। ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈলা পরম সুবাস॥
শালিধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। চিনি কর্পূর দিয়া তায় লাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি॥
গঙ্গার মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া। পাঁপড়ি করিয়া নিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃতপাত্রে সোন্দাইয়া দিল ভরি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলি॥

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁহাদের সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া অবলম্বন করিতে হয়। যদি শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া, বসিয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাঘব যে ঝালি সাজাইয়া পাঠাইতেন, তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত। কিন্তু অন্যান্য ভক্তগণও ঐরূপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া, মালিনী এবং বহুতর ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে উপহার দিতেন, তাহা গোবিন্দের হাতে রাখা হইত। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও" সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন, "আচ্ছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদায় ভুঞ্জান কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে, ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহুবার নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আস্বাদনের সময় থাকে না। সকল ভক্তেই জিজ্ঞাসা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছ ?" গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই, অপেক্ষা কর।" এইরূপ প্রত্যহ শত শত ভক্ত আসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রব্য দিয়াছিলে ?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, সুবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্য অবশ্য আমার দ্রব্য অগ্রে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "আচ্ছা"।

এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন করেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। প্রভুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ লইলেন;

বলিলেন, "প্রভো ! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভু বলিলেন, "কি ? তোমার আবার দুঃখ কি ?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আস্বাদ কর। আমি তোমাকে ভুঞ্জাইতে পারি না। সকলে প্রত্যহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যখন শুনেন যে আমার দ্বারা তাঁহাদের কার্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খান।"

প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? কে কি উপহার আনিয়াছেন লইয়া আইস।" এই কথা বলিয় প্রভু বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ এক এক জনের দ্রব্য আনিতেছেন আর বলিতেছেন, "ইহা মা জননীর"। প্রভু হাত পাতিয়া বলিলেন "দাও"। ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা শ্রীবাসের"। এইরূপে গোবিন্দ এক-একজন ভক্তের দ্রব্য প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, আর প্রভু আহার করিতেছেন। এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যে এক যজ্ঞের উপযুক্ত সমুদায় সামগ্রী প্রভু আহার করিলেন ; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে ? তখন গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর কিছু নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা অন্য থাকুক।" পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবানের কাচ-কাচা সহজ নহে,—মনুষ্যে পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয়ভক্ত। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া তিনি সঙ্গে লইয়া যান,—এমন কি, কুক্কুর পর্যান্ত। প্রকৃতই একটি কুক্কুর যাত্রি-গণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কাজেই এই জন্মে কুক্কুর হইলেও, তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুক্কুরকে ডাকিয়া আহার দেন। পথে এক নাবিক কুক্কুরকে পার করিতে অস্বীকার করিল। শিবানন্দ অনুনয় বিনয় করিলেন, নাবিক শুনিল না। তখন তিনি দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরকে পার

করিলেন। একদিন প্রভাতে শিবানন্দ কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ দুঃখিত হইয়া কুক্কুর তল্লাস করিতে দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুক্কুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এমন কি, উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। ফল কথা, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস যে, এই কুক্কুর সামান্য বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর নিকট কেন যাইতেছেন। শিবানন্দ সেন শান্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন, এবং ভক্তগণ সহ নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই কুক্কুর প্রভুর অল্প দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরূপে? না, প্রভু নিজ হস্তে তাঁহাকে নারিকেল-শস্যখণ্ড ফেলিয়া দিতেছেন, আর কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল," আর কুক্কুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুক্কুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই মাস নিকটে রাখিয়া দিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব-গৃহীণীরাও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এবার একটি পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী

গোসাঞীর নামে তাহার নাম রাখিবে। তাঁহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। শিবানন্দ সেন বাড়ী যাইয়া দেখিলেন তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

শিবানন্দের বড় সাধ, পুত্রটিকে লইয়া গিয়া প্রভুকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র। তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে অত দূরদেশে যাইতে দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া, আর শিশু-পুত্রটিকে নিজে কোলে করিয়া, নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। একটি ঘাটিতে কয়টী ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে পাঠাইয়া দিলেন, আর আপনি ঘাটিতে দান বুঝিয়া দিতে জামিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন্দ সেনের তিনটি পুত্রকে শাপ দিতেছেন, বলিতেছেন, যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটি ছেলে ম'রে যা'ক। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে পুরি নগরীতে লইয়া যান। তাহার পর, ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। ঘাটীরক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। তিনি সকলকে ছাড়াইয়া, তাহার প্রাপ্য দিবার নিমিত্ত সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন দোষ নাই। যত অপরাধ সমুদায় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুনুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে শুনাইয়া তাঁহার পুত্রকে শাপিয়াছেন। ঘরণী ইহাতে ভয় ও দুঃখে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানন্দ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পত্নী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, গোসাঞী 'তিন পুত্র মরুক' বলিয়া

শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞীর বালাই লইয়া মরিয়া যা'ক"। ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট গেলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া অমনি উঠিয়া এক লাথি মারিলেন। শিবানন্দ লাথি খাইয়া আর কিছু না বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে স্নানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন সুপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার দুর্লভ ধন। আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, দেহ পবিত্র হইল।" নিত্যানন্দ অগ্রে চঞ্চলতা করিয়াছেন, কিন্তু বাসা পাইয়াই একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তাহার পরে শিবানন্দ যখন আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন 'অভিমানশূন্য, অক্রোধ পরমানন্দ" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের অন্যায়, কিন্তু অদ্বৈতের কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল "হাস্যময়"। সকলেই জানে "নিতাই মার খাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মার্ খাইয়া দয়া করেন, তিনি অবশ্য মারিয়াও দয়া করেন। শিবানন্দ তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি খাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্তু শ্রীকান্ত অল্পবয়স্ক। তাহার মাতুল পিতৃসম্পর্কীয়, বেশ গণ্যমান্য। তিনি তিন শত ভক্তের সম্মুখে লাথি খাইলেন, ইহাতে শ্রীকান্তের ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞী যাহাকে লাথি মারিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। টাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্রভুর নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শ্রীকান্ত যাইয়া একেবারে প্রভুর

নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষক বা পেটাঙ্গি খুলিতে হয়।

প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহার মনে কি দুঃখ তাহা বলিবার অগ্রে আপনিই অবগত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুর দর্শনে তাহাও তখন অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন?" শ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নাম শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "আচার্য্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন?" এ কথা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কখনও শুনিতে পান না। তাহার পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যত ভক্তি করেন, এমন আর কাহাকেও করেন না;—এমন কি, পুরী ভারতীকেও নহে। স্বরূপ প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিলেন, এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে ঐরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভু আপনিই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ প্রভু কর্কশ বাক্য বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, বলিতে পার আচার্য্যের এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে না কি?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুরএই কথার তাৎপর্য্য ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। যখন দুই দলে মিলিত হইল, তখন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন। তখন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কৈ? আমায় দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা পরমানন্দ পরে তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' লিখেন। তাহার একটি শ্লোক এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠিরবেন্দ্র।
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ॥
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

যখন পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা গৌরাঙ্গ কই?" তখন শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভু কে, তাহা কি দেখাইয়া দিতে হয়? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, যাঁহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উঁহাকে প্রণাম কর!" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতাপুত্রে দূর হইতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পুত্রটীকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন,

শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাসায় সর্ব্বদা লোকে পূর্ণ। কয়েক দিন পরে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট দিয়া এক দিবস প্রভু তিনটী ভক্ত সহ যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরণী ইহা দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবান্! একবার দাসানুদাসের বাটীতে পদধূলি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।" ইহা শুনিয়া প্রভু "তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখানে আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। প্রভু কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না কিন্তু যাঁহাদের উপর বাৎসল্য ভাব, কি যাঁহারা গুরুজন, এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন। প্রভুকে বাসায় আনিয়া সেন মহাশয় সেই সপ্তবর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবান! এই তোমার সেই বরপুত্র। ইহার নাম আপনার আজ্ঞাক্রমে 'পরমানন্দ দাস' রাখিয়াছি, আর আপনি ইহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এতদূরে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নেহার্ত্ত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদান করিলেন। বাল্যস্বভাবশতঃই হউক, বা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন

শিশুসন্তান স্তনপান করে, সেইরূপ দুই হস্তে শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ণ মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন।

প্রভু যখন এই চরণাঙ্গুষ্ঠ সেই বালকের মুখের মধ্যে দিলেন, তখন কি বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাসের "বৃন্দাবনচম্পূতে" লিখিত আছে। (স্মরণ থাকে যেন, এই পরমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন। তিনি চৈতন্যচরিত, বৃন্দাবনচম্পূ ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—)

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃস্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং
দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।

"হে বৎস্য দেবদুর্লভ বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে।" পরমানন্দ বলিতেছেন, "ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন।"

পরমানন্দ পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বৎস, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ। "পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তখন আবার বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন না। তখন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে কৃষ্ণ বলাইবার নিমিত্ত অনুনয় তাড়না ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মর্ম্মাহত ও যেন প্রভু পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তখন প্রভু যেন বিস্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি বিশ্ব-সংসারকে কৃষ্ণ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না?" প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন। বালক মনে

ভাবিতেছে যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে। এই বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়।”

তখন প্রভু বলিলেন, “তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়, তবে, হে বৎস! যাহা কিছু হয় বল।”

ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে, তাহার তখন ক খ পাঠ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।) পরমানন্দের শ্লোক যথা:—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি॥

অর্থাৎ “যিনি ব্রজযুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে সুরস অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গের অথবা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।”

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পত্নী ও প্রভুর সঙ্গী যে দুইজন ভক্ত ছিলেন সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, “বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই শ্লোকে প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণনা করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি ‘কবিকর্ণপুর’ হইল।” পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কবিকর্ণপুর কৃত পুস্তক এখন বৈষ্ণবজগতে অনন্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্বত্যৈকশেষং গতে।
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্॥

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা (অর্থাৎ পদাম্বুষ্টের রজ) পাইয়া যাহা লিখিলাম, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধান হইলেন। সুতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথ্যা লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে ? তবে, হে কৃষ্ণ ! তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি তুষ্ট হইবে, (এবং যদি মিথ্যা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে।)

জগতের যত অবতারের কথা শুনা যায়, তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার যে সমুদায় প্রমাণ রহিয়াছে তাহা অকাট্য। সেই প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি কি বলিয়াছেন ও কি করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কশবাক্য বলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভু তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅদ্বৈতের উপর বিরক্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতেও দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। অদ্বৈতপ্রভুর বৃহৎ পরিবার,—ছয় পুত্র ও দুই স্ত্রী। শ্রীঅদ্বৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনাটন। বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন যে, উড়িষ্যার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অচলসংসার কুলাইবার নিমিত্ত তিনি এক উপায় সৃজন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে

লেখা ছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। মহারাজের নিকট সেই ঋণ শোধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই পত্র কেমন করিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রত্যক্ষ্যে কিছু বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যখন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশ্বাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্যই তিনি দণ্ডার্হ, অতএব তিনি যেন আমার এখানে না আইসেন।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যখন বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তখন নিতান্ত লজ্জা পাইয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্য।" প্রভু তখন হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া, বলিলেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। ঐরূপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভুর পার্ষদগণ রাজার দ্বারস্থ হয়েন, তবে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভু প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীলালেখকগণ বলেন যে, প্রভু জীবনিস্তারের বহুবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য সৃষ্টি, যেমন কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ—সাক্ষাদ্দর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন;

করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ—আবির্ভূত হইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননী প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন আহার। শচী অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব ?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তখন বসিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। পরে যখন চেতন পাইলেন, তখন ভাবিলেন, "এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এখানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে আবির্ভাব। এইরূপ শচীর গৃহে সর্ব্বদা হইত। আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, সে "আবেশ"। প্রভু নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর, অঙ্গের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই নবীন ব্রহ্মচারী গ্রহগ্রস্তপ্রায় নাচিতে কাঁদিতে হাসিতে লাগিলেন। আর সকলেই বলেন, "কৃষ্ণ বল"। চারিদিকে প্রচার হইল যে, নকুলের দেহে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া শিবানন্দ তথ্য জানিবার জন্য সেখানে চলিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন অসংখ্য লোক জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। তখন শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি সত্যই আমার প্রভু তুমি নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশ্য তুমি জান, এবং তাহা হইলে তুমি আমাকে নিশ্চয় ডাকিবে, এবং আমার ইষ্টমন্ত্র কি তাহা বলিবে। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানন্দের মনে অবশ্যই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া

থাকেন, তবে তাহাকে জানিবেন ও তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। শিবানন্দ লোক-সংঘটের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই চারি জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া "শিবানন্দ সেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ডাকিতেছেন" বলিয়া খুঁজিতে লাগিল। একথা শুনিয়াই শিবানন্দ দৌড়িয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারি বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। তোমার চারি অক্ষরের "গৌরগোপাল মন্ত্র"।* এই আখ্যায়িকাটি শিবানন্দের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপে নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরিতামৃত বলিতেছেন,—"এই মত আবেশে তারিল ভুবন। গৌড়ে দেহে আবেশের দিগ্‌দরশন॥" অর্থাৎ গৌড়ে যেরূপ ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত প্রভুর প্রকটকালেই কোটী কোটী ভক্ত তাঁহার পদাশ্রয় করেন। আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ব্ববঙ্গদেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়,—তবুও সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবামাত্র শাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষমাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ দুই জনে প্রভুকে অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার

---

*একবার একটা কথা উঠে যে "গৌর-নামের মন্ত্র নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র "গৌরগোপাল।"

উপরে পাত, ঐ এল প্রাণনাথ," ভাবে কাটাইলেন। কিন্তু প্রভু আসিলেন না। তখন দুই জনে হাকাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে নাম ছিল 'প্রদ্যুম্ন', প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ, যেহেতু ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর ভজন ছিল 'মানসিক'। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মত্ত হয়েন। কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগে যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেও সেইরূপ সমাধি আছে। প্রভু সন্ন্যাসের পরে চারি দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ যোগের বিশেষ লাভ এই যে, ইহাতে যোগীর যে প্রাপ্তি তাহার সহিত কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হয়।

এই নৃসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভু যে বার গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, কিন্তু কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসেন। প্রভু ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী এই কথা প্রকাশ করেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ইহা কিরূপে জানিলেন? তাহাতে নৃসিংহ বলেন যে, প্রভু যেমন বৃন্দাবনে গমন করিতেছিলেন, তিনি (নৃসিংহ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নৃসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া যাইতে প্রভুর কষ্ট হইবে, তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবার জন্য মনে মনে পথ যোজনা করিতেছিলেন। সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, আর পথের দুধারে ফুলের গাছ, তাহার উপরে বসিয়া পক্ষীগণ গান গাইতেছে। কুসুমের শোভায় ও সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে যোজনা করিয়া প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। আর প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন যাহাতে তাঁহার শ্রীপদ

চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে দুইবার ভোগ দিতেছেন, সন্ধ্যায় উত্তম কুটীরে শয়ন করাইতেছেন ও পদসেবা করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভুকে কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না।"

এই নৃসিংহ, শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কারণ শুনিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই কথা? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এখানে তাঁহাকে ভুঞ্জাইব।" ইহা বলিয়া নৃসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্ত সংযম করিয়া এবং উহা বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত কখন আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাঁহার যে কার্য্য তাহা ভুলিয়া, অন্যদিকে যাইতেছেন, নৃসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপে বহু কষ্টে চঞ্চলচিত্তকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন্দ সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরূপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কখন নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের দুইদিন গেল। ইহাকে বলে 'ভক্তিযোগ'। যাহা হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ, প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী আনিয়া উত্তমরূপে ভুঞ্জাইলেন।

কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিয়া সমুদায় আহার করিলেন নৃসিংহের মুখের কথা ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রভু

কিন্তু ইহার প্রমাণ পরে দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে, কথায় কথায় এই সমুদায় কথা (অর্থাৎ যেরূপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন) বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন যে, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে ব'লে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদয় হইয়াছেন, ইহা কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন,—সকলে নহে। এইরূপ প্রভুর আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র এবং অন্যান্য ভক্ত-গৃহিণীরা চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরণীও চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেখানে বাস করেন ততদিন সেই রূপ থাকেন, থাকিয়া তাঁহার দেশীয় ও গ্রামস্থ সঙ্গিগণের সহিত আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর এক পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট, বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা পরমেশ্বরের নন্দন মুকুন্দের সহিত প্রভু খেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভুকে অনেক সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যখন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি পরমেশ্বর," তখন প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সহাস্যে আদর করিলেন; বলিতেছেন, "শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তখন পরমেশ্বর আহ্লাদে আর থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমি আসিয়াছি, মুকুন্দের মাও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু শঙ্কিত হইলেন; ভাল মানুষ

পরমেশ্বর হয় ত "মুকুন্দের মাকে" প্রভুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। যখন পরমেশ্বর ছোটবেলা প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছুকাল পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-বস্তুকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার তিন সপ্তাহের পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিষ্য; যেখানে তাঁহার শিষ্য সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি রামচন্দ্রপুরী। ইনি যদিও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেন্দ্রপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, যে মাধবেন্দ্র "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, যে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি,—তাঁহার শিষ্য হইয়াও রামচন্দ্র চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক! তিনি সোঽহং অর্থাৎ 'সেই আমি' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ কি কৃষ্ণপ্রেম, এ সমুদায় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেন্দ্র তাঁহার অপ্রকটকালে কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন সুবিধা পূর্ব্বে কখন পান নাই। মাধবেন্দ্রের তেজে ও ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কাজেই বড় সুবিধা পাইয়া বলিতেছেন, "গুরো! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রোদন কর? কাহার জন্য রোদন কর? তুমি যাহাকে কৃষ্ণ বল তুমিই না সেই কৃষ্ণ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত হওয়া উচিত! রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" তখন মাধবেন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর উপদেশের

প্রয়োজন নাই। একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জ্বালায় আমি জর্জ্জরিত, তাহার উপরে তুই আসিয়া আমায় বাক্য-যন্ত্রণা দিতে লাগিলি? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তোর ও সমুদয় নাস্তিক-বাদ শুনিলে আমার পরকাল হইবে না।"

রামচন্দ্রপুরী তাঁহার গুরুর সহিত এই রূপ ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরী গুরুর প্রকট সময়ে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত অতি যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচন্দ্রপুরী ক্রমে এক অপরূপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সুতরাং কোন কার্য্য নাই,—কেবল ভ্রমণ; একস্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই অন্ন ও দুগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী ভারতী পর্য্যন্ত আসিলেও তাঁহারা প্রভুর সম্মুখে নম্র থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞীও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাধবেন্দ্র। প্রভু যখন প্রথমে পুরী ও ভারতী গোসাঞীকে প্রণাম করেন, তখন তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সে ধা'তের লোক নহেন। জগদানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচন্দ্রও উদর পুরিয়া ভোজন করিলেন। শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যত্ন করিয়া অনুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত

হইলে বলিতেছেন, "জগদানন্দ! তোমার রীতি কি? আমি সন্ন্যাসী, আমাকে এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমার ধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? তোমাদের চৈতন্যের গণের কি ভয় নাই যে, সন্ন্যাসিগণকে অধিক খাওয়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট কর? আর নিজেরাও এত খাও? আমি শুনেছি যে তোমরা চৈতন্যের গণ বড়ই খাওয়ায় মজমুত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফল কথা, "চৈতন্যের গণ" খাওয়ায় মজবুত তাহার সন্দেহ নাই। কারণ চৈতন্যের গণের শুষ্ক-ভজন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাহারা দেহকে দুঃখ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার করার মত কার্য্য করা হয়। মাথা কুটিয়া উপবাস করিয়া ও দেহে কষ্ট দিয়া, পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হইতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ দেখুন, ব্রজগোপী, কি ব্রজগোপীর শিরোমণি রাধা। রাধা কিরূপে সুন্দরী হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন, "ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি।" শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে জাগরিত কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ সুখ অনুভব কর, তখন তোমার সোণার বরণ হইবে।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে কোনরূপে জব্দ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপি হইয়াছে; যাহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া না মানে, তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাজন। রামচন্দ্রপুরী হিংসুক, তাঁহার এ সব সহ্য হয় না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন প্রভুর গণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ করা। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরূপে শয়ন করেন, কিরূপে দিনযাপন করেন,—ইহার

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিদ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গীদিগের নিকট যাইয়া প্রভু সম্বন্ধে সমুদায় গুপ্ত কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুপ্তকথা কিছু নাই তাই পান না। তিনি ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিন্দা করেন; বলেন যে, "চৈতন্যের ইন্দ্রিয়-বারণ কিরূপে হইবে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় বারণ হয়?" ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহ্য করিয়া থাকেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তবুও তিনি উপস্থিত হইলে, প্রভু অতি নম্র হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

ফল কথা, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহাকে বাহ্যে ভক্তি করেন; কিন্তু অন্তরে তাঁহার কার্য্যকে ঘৃণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস হইত না। পরে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ, কিছু বলেন না। কাজেই ক্রমে ভয় ভাঙ্গিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সম্মুখেই তাঁহার নিন্দা করিলেন। একদিন প্রভুর সম্মুখে বলিতেছেন, "এখানে পিপীড়া বেড়ায় কেন? অবশ্য এখানে মিষ্টান্ন ব্যবহার হয়।" আর কোন দোষ না পাইয়া বলিলেন যে, প্রভুর বাড়ীতে পিপীড়া, অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন, যদিচ সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তখনই প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পুর্ব্বাবধি আমার ভিক্ষার নিয়ম ছিল চারি পণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত, অদ্যাবধি তাহার সিকি আসিবে। ইহার যদি অন্যথা কর, তবে আমাকে এখানে পাইবে না।"

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্রও তাহাই করিবেন। প্রভু অনশনে থাকেন, তাঁহারা কিরূপে ভিক্ষা করিবেন?

সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তাঁহারা যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথায় আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন ? তিনি হিংসুক, আপনার কিম্বা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি দুষেণ না, কেবল নিজের কুপ্রবৃত্তির নিমিত্তই ঐরূপ করেন। কিন্তু প্রভু জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন, আর সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তৃণাদপি শ্লোক করিয়াছেন ; তিনি আর কি করিবেন ? যখন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রভু তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন ; বলিলেন, পুরী গোসাঁইর দোষ কি ? তিনি সহজধর্ম্ম বলিয়াছেন ; সন্ন্যাসীর জিহ্বা-লালসা থাকা ভাল নয়।

এদিকে পুরী গোসাঁই মহাখুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন খানিক অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকট আসিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনিলাম তুমি নাকি অর্দ্ধাশন কর ? সে ভাল নয়, যাহাতে দেহরক্ষা হয়, এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে কিরূপে ? প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরমভাগ্য।" যাহা হৌক রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না ; এমন কি, প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

এখন অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃস্থানীয়। পুত্রের যেরূপ পিতাকে করা উচিত, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎপূজ্য। কিন্তু তুমি কর কি ? না, তাঁহার দোষ অনুসন্ধান কর। প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ। যেরূপ দেহ সেইরূপ ভোজন চাই কারণ তুমি নিজেই বলিতেছ

যে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। অথচ তুমি তাঁহার ভোজন কমাইয়া তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শুধু তাহা নয়, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্য্যন্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া, বাড়ীতে পিপীড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া, তাঁহাকে দুষিতে ছাড় নাই। কিন্তু ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যখন রামচন্দ্রকে দুষিলেন, তখন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। এরূপ সহিষ্ণুতা জীবে দেখাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখেন যে, দ্বারে একজন দাঁড়াইয়া, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী. পরম সুন্দর, ঠিক ঠাকুরের মত। ঠাকুর ভাবিয়া নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সেই ভদ্রলোক তটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসানুদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "তবে তোমার বপু ঠাকুরের ন্যায় কেন ?" তিনি বলিলেন যে ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাতুরকে জল দিয়াছিলেন। তখন নারদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, দেখেন সকলই ঐরূপ চতুর্ভুজ ; ঠিক ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকেও প্রণাম করেন না। তবে আরও দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি পুণ্যে ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন ? সকলেই অতি সামান্য কারণ বলিলেন। কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার কৃষ্ণনামা পুত্রকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন। এই সমুদায় সামান্য কারণে তাঁহারা এত কৃপা পাইয়াছেন। শ্রীনারদ তল্লাস করিতে করিতে শেষে ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, "ঠাকুর ! একি ভঙ্গী ? ইহাদের প্রতি এত কৃপা কেন ?" ঠাকুর বলিলেন, "ইহারা নিজ গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বপু

পাইয়াছেন।” নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, “ইহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই ?” ঠাকুর বলিলেন, “কই, বিশেষ কিছু নাই।” তখন নারদ বলিলেন, “তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি ?” তখন ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনার দেহের ভৃগুপদচিহ্ন দেখাইলেন। বলিলেন, কেবল “এইটী উহারা পান নাই।”

ইহার তাৎপর্য্য পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন। মুনিদের মধ্যে বিচার হইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—ইহাদের মধ্যে কে বড় ? ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন। ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গেলেন। তিনিও গালি সহ্য করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া ভৃগুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তখন কৃষ্ণের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন আমার প্রধান ভূষণ হইল।” কথা এই, ভগবানের যে দীনতা ও সহিষ্ণুতা তাহা জীবে অনুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্য্য নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া গেলেন, প্রভুর ভোজন অর্দ্ধেক কমাইলেন। পূর্ব্ব নিয়ম ছিল চার পণ, সে অবধি নিয়ম হইল দুই পণ। ইহাতে প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন কেন ? বোধহয় জীবের কঠিন-হৃদয় দ্রব করিবার নিমিত্ত। কারণ সেই পরম সুন্দর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত তাহারই হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

নবম অধ্যায়

প্রভুর দেহ কৃষ্ণবিরহে জর-জর, রোদনে প্রত্যহ শত-শত কলস নয়ন-জল ফেলিতেছেন। শত কলস বলিলাম, ইহা অত্যুক্তি নয়। প্রভু যখন নৃত্য করেন, তখন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষার ধারা উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহার চতুঃপার্শ্বে যাঁহারা থাকেন, মহাবৃষ্টিতে যেরূপ হয়, তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভু একটু নৃত্য করিলে সেই স্থান কর্দ্দমময় হয়। একটি প্রাচীন ছবিতে দেখিয়াছিলাম যে, প্রভু সমুদ্রতীরে ভক্তগণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, তবু কর্দ্দমময় হইয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দ্দমে প্রভুর নৃত্যকালীন পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেখানে শত শত কলস নয়ন-জল ফেলা হইয়াছে। প্রভু ক্রমে ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরমসুন্দর দেহে ক্রমে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। প্রভু কঠিন মৃত্তিকার উপর একখানি শুষ্ক কলার পাতায় শয়ন করেন। ইহাতে অঙ্গে ব্যথা লাগে।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, আর একটি তোষক করাইলেন। এই দুই দ্রব্য স্বরূপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" স্বরূপ ইহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে কষ্টে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহারও প্রাণে সহ্য হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বালিস ও তোষক দূরে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে করিল ?" স্বরূপ বলিলেন, "জগদানন্দ॥" তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন। কারন যদি প্রভু বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানন্দ উপবাস করিয়া

পড়িয়া থাকিবেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "জগদানন্দের বড় অন্যায়। আমাকে তিনি বিষয় ভুঞ্জাইতে চাহেন। যদি তোষক বালিস আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার ভৃত্য আনো; তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" স্বরূপ জগদানন্দের উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ বড় দুঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভু শুনিলেন না। তখন স্বরূপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একরূপ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শুষ্ক কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন, এবং এই সমুদায় প্রভুর বহির্ব্বাসে পুরিলেন; এইরূপে তোষক ও বালিস হইল। ভক্তগণ তখন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু ভক্তের অনুরোধে এই শয্যায় শয়ন করিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হৃদয় ব্রজে। প্রভু বাহিরে, অন্যে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভু যাহা দেখেন তাহা অন্যে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব বৃক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন শ্যামসুন্দর কদম্ব-বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝুলাইয়া বেণুগান করিতেছেন।

জগদানন্দ গৌড়ে গিয়াছেন। যথা পদ :—

"নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কতদূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। ধ্রু।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায়॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা!
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা॥

ডালে বসি পাখী, মুদি ছুটি আঁখি, ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যুথে যুথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ে গা॥
ক্ষণেক রহিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রেবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, কাহার নাহিক স্পন্দ॥
না মেলে পসার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী, প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বসনে, মুদিত নয়নে ধারা॥
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব, দেখিয়া পথিক জন।
শুধাইছে তারে, কহ মো সবারে, কোথা হৈতে আগমন॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দর, পাঠাইলা মোরে, তোমা সবারে দেখিতে॥
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহিল গিয়া।
আর একজন চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধাঞা।
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শ্রীবাস, যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি॥
মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি।
তাদেরে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইলা গৌরহরি॥
শুনি শচী আই, চমকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কতদূরে॥

দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয়॥
গৌরাঙ্গ চরিত, হেন রীত নীত, সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সবাকারে সুখ দিয়া॥
এ চন্দ্রশেখর, পশুর দোসর, বিষয় বিষেতে প্রীত ;
গৌরাঙ্গ-চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত॥

এইরূপে জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি শচীমাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়াজী ঠাকুরাণী। পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করেন। আর যে দিন নিতান্ত তুমি তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিনই তিনি আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন. "সে ঠিক কথা, কিন্তু নিমাই কি সত্যই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বসিয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিয়া বসিল, আর আমি যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতন লাভ করি, তখন সমুদায় স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন যত দূর পারেন তোমার দুঃখ নিবারণ করিবেন ; সেই নিমিত্ত তিনি সত্যই আসেন এবং তোমার সম্মুখে বসিয়া আহার করেন।" এইরূপে

কখন জগদানন্দ, কখন বা দামোদর, প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করেন।

পরিশেষে জগদানন্দ ভক্তদিগের বাড়ি বাড়ি যাইতে লাগিলেন। প্রভু সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। পুরীর মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, এবং পুরীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগন্নাথ, অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রেরই ঠাকুর; ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্ব্বর, সকলেরই ঠাকুর। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং, ঈশ্বর এক, তাঁহারই দ্বিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।

অতএব মনুষ্য মনুষ্যের ভ্রাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার দাস,—তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দম্ভ বিড়ম্বনা মাত্র, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। জীব মাত্রেই সমান,—ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট ইহা বিষম অপরাধ। শ্রীজগন্নাথ ঠাকুর জগতে দুই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর এক, জীবমাত্রই তাঁহার সন্তান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নাই॥

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? ব্রাহ্মণঠাকুর ইহার নানা কারণ দেখাইলেন, কিন্তু কোন কারণই টিকিল না। শেষে বলিলেন, "শূদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তাহাদের আচার বিচার ভাল নয়।" কিন্তু শূদ্রও যখন শ্রীকৃষ্ণের জীব তখন শূদ্র যদি তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অন্ন দেয় তবে তিনি কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদুরের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্য শূদ্রের হস্ত

অন্ন খাইবেন।” তাহা যদি হইল, অর্থাৎ শূদ্রের দত্ত অন্ন সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রীভগবান যখন গ্রহণ করেন, তখন তুমি মানব, ব্রাহ্মণ হইলেও তবু কৃষ্ণের দাস, ক্ষুদ্রকীট, তুমি তাহা কেন গ্রহণ করিবে না? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল,—শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণকে খাইতে হইল।

মহাপ্রভু এ লীলা কিরূপে করিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার কর্ত্তব্যে নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবুও বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না,—পূর্ব্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাহ্মণঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে, ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে, বন্ধন করিয়াছেন। আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অন্যে করে না। কাজেই আপনাদের সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চিরজীবন যায়, প্রকৃত সাধনভজন হয় না। কিন্তু প্রভুর সরল ধর্ম্মে সে সমুদায় বন্ধন থাকিল না। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহার “বাহ্য-প্রতারণা” নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি, বৈষ্ণবের সন্ন্যাস পর্য্যন্তও নাই। তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।”

কথাটি মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে

* একজন খৃষ্টিয়ান মহাপ্রসাদ কিনিয়া একটি ব্রাহ্মণের হস্তে দিল। মনে ইচ্ছা ব্রাহ্মণঠাকুরকে জব্দ করা। কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া উহা বদনে দিলেন। এ কথা, হণ্টর সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে।

শ্রীভগবানের, কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্রজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা। অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতার-বাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্ব্বভৌমও সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যুষে তাঁহার হাতে "মহাপ্রসাদ" অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পক্কান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবুন, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন, তখন সার্ব্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তখন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুদায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। যেহেতু আজি বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করিলে।" অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈদিক নিয়ম নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মে সন্ন্যাস নাই, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারানসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার ভোটকম্বল একজন কাঁথাধারীকে দিয়া তাহার কাঁথা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কাঁথা দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু লোক, দোলায় উঠিয়া বেড়ান। তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই

দুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব বেদ-বিধির বাহিরে।

যখন এই ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইবে, তখন ভারতে জাতি-বিচার, বর্ণ-বিচার, ছোটবড়-বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন। ভারত-বর্ষীয়গণের এক ঠাকুর লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা সজীব হইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না, তবে অন্য স্থানে ইহার অনাদর কেন? যদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্তু সর্ব্বত্রই সেইরূপ পবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না,—কারণ সমাজের ভয় করেন, তাঁহাদের মনের জড়তা যায় না। মহাপ্রসাদের গেল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধার দ্রব্য আছে, (যথা চরিতামৃতে) "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥"

ভক্ত, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা রাখেন, তাহা মহাপ্রসাদ অপেক্ষা আরো পবিত্র। কবিরাজ গোস্বামী, কলিদাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়স্থ, পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবমাত্রেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন,—ক্ষুদ্রজাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন না। ঝড়ু ঠাকুর জাতিতে ভুমিমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাঁহার নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়ু ঠাকুর আম্র ভক্ষণ করিয়া যে আঁটি ফেলিলেন, কালিদাস তাহা গোপনে চুষিয়া খাইলেন। কেবল মাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই তাহার সেবা। কালিদাস

যখন মহাপ্রভুকে দর্শনার্থে নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বড় কৃপা করিলেন। যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিত্র বস্তু হয়, তবে গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিষ্ট কেন হইবে। যদি ঝাড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায় থাকিল ?

জগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে অদ্বৈতের নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণের সংবাদ সমুদায় বলিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে একটি তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তরজাটি এই—

প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

জগদানন্দ এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন ; হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যে আজ্ঞা।" সকলে ভাবিলেন, এই একটি রহস্য বাক্য বই নয়। কিন্তু স্বরূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু এ তরজার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, আপনি বুঝাইয়া বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন, "অদ্বৈত-আচার্য্য আগম-শাস্ত্রে পণ্ডিত। সেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল পূজা করা হয়, পূজা সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে

বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আচার্য্য বোধ হয় তাহাই বলিতেছেন, আর কিছুই নয়। তবে আমিও তাঁহার মন বুঝিতে পারি নাই।' এই কথা শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ স্বরূপ, অবাক হইলেন ; যেহেতু তিনি বুঝিলেন যে, এই তরজার মধ্যে "সর্ব্বনাশ" রহিয়াছে।

এই তরজার অর্থ লইয়া মহা-মহা পণ্ডিতগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। আমার পাণ্ডিত্য নাই তবে আমি ইহার সহজ কি মানে বুঝিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল-মহাজন, আর শ্রীঅদ্বৈত আর এক বাউল, উপরিউক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন, "হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াছিল। লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না" এখন ইহার বিচার করুণ।

"মহাপ্রভু-মহাজন" তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিয়াছিলেন। তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুলমাত্র ছিল না, জীব হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু-মহাজন, ভবের হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বা বুভুক্ষুলোক চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলাপূর্ণ হইল, আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই, যিনি দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন-মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল

আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটি শ্রীচরিতামৃতে আছে। আর একটি ঘটনা পাঠক মনে করুন। প্রভু উপবীত-কালে এক দিবস একটী সুপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে, "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু, প্রকাশ পর্যন্ত এইরূপ মুহুমুহু লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন, "আমি চলিলাম," বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়েব দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে যে সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেহ সাজাইতে পারে না; সাজান হইলে ইহা আর এক প্রকার হইত। সুপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এইরূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধ হয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের তরজাটিও তদ্রূপ। উহা একটি কল্পিত কথা নয়। পড়িলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন্দ বলিলেন ও হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলে স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় যে কল্পনা নয়, তাহা পড়িলেই মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত খৃষ্টিয়ান মিশনারীদিগের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, যীশু যে শ্রীভগবান কি ভগবানের "বিশেষ" কেহ, একথা মোটেই পাওয়া যায় না। "ঈশ্বরের পুত্র" বলিয়া যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব

যীশু অবতার নহেন। কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় থাকেন, এখন দেখা যাউক। প্রথমতঃ প্রশ্ন এই,—প্রভু যদি স্বয়ং ভগবান হইতেন, তবে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন?

ইহার উত্তর এই—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা হৃদয়ঙ্গম, কি উহার অনুকরণ, কি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটী মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌রূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি। আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের সকলের নিমিত্ত, আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিব। সেই ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার, অন্য-ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। কিন্তু ইহা মুখে শিক্ষা দিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আপনি ভক্তভাব ধরিয়া, আমাকে কিরূপ ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তখন তোমরা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? এ কি দিবস, না রাত্রি? আমি কোথায়? আমি কি, কিছু প্রলাপ করিয়াছি?" ভক্তগণ সমুদায় গোপন্ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে।"

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের দুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব; যথা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিত, কি তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। তাহার পরে পূর্ব্বের কথা মনে করুন। যীশু কখন আপন মুখে স্বীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তু। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কি কখন স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীভগবান্? তিনি শত বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, 'তিনি সেই শ্রীভগবান্, জীবের হৃদয়ে বাস করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্দিগ্ধচিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, সে "তাঁহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে কৃষ্ণ, ইহা তিনি অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন। অধিরূঢ় ভাবে গোপীগণ অভিমান করিতেন যে তাঁহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ প্রভু অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন যে তিনিই কৃষ্ণ। কিন্তু "মহাপ্রকাশ" বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে "প্রকাশ" উহা প্রলাপ নয়। তাহার পর মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, "অন্য দিন প্রভু বিষ্ণুখট্টায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন,—যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্টায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়া করিলেন না, সহজ অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।"

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন "আমি সেই"; আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন যে "তিনি সেই।" 'আমি সেই' এ-কথা বলা সহজ, কিন্তু এ-কথায় উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে যদি শ্রীভগবান্ মনুষ্যের মধ্যে আগমন করেন, তবে তাঁহার এই সংসার তদ্দণ্ডে ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান্ যদি তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, তবে জীবগণ কিছু করিবে না—

খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ শেষে কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন, "তুমি যাও, আমরা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান্ লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন। অন্যান্য সময় তিনি ভক্তভাবে থাকিয়া, ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া, জীবকে শিখাইতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি :—

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি—তাঁহাকে শত শত বার পরীক্ষা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রভু যে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিতেন যে, তিনি শ্রীভগবান্, আর আপনার চরণ গঙ্গাজল-তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি যে শ্রীভগবান্ তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যখনশ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন যে তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, "যদি নিত্যানন্দ অতি মন্দকার্য্যও করেন তবু তাঁহার চরণকমল স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দ্য। শ্রীঅদ্বৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্লাদ প্রভৃতির পূর্ব্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বড়।" এখন

দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন আর প্রভু সহজ অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন।

'তরজার অর্থ এই যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৪ বর্ষ, তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রকাশের পর হইতেই কার্য্যারম্ভ হইল। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভু প্রচার করিলেন—সিন্ধু হইতে কন্যাকুমারি পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ প্রেমের বন্যায় ডুবিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ আচার্য্য সৃষ্ট হইল, কোটি কোটি লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ৩৬ বৎসর তখন অদ্বৈত এই তরজা পাঠাইলেন এবং প্রভুকে জানাইলেন যে, "প্রভু, আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। যে জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইয়াছি। এখন আপনি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।" প্রভু উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস হয় যে, গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্য্য। অতএব হে জীব, তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

এই সুযোগে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় শ্রীপ্রভু বৃদ্ধ জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি ও ইহার প্রমাণ দিয়াছি, অর্থাৎ বলিয়াছি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি,—আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহাই আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, ইহা কি হইতে পারে? আর তুমিই বা এরূপ কথা লিখিলে কিরূপে?" কিন্তু আমার অপরাধ কি? আমি লীলা-সংগ্রাহক, প্রামাণিক যাহা

পাইব তাহাই লিপিবদ্ধ করিব,—ইহা ভাল কি মন্দ অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দাবর্দ্ধক তাহা বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তাহা যদি করিতাম, তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভুর লীলাকাহিনী যেরূপ পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ দিয়াছি। যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ইহা গ্রহণ করুন, না হয় না করুন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভু যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পন করেন, ইহাতে তোমার আমার ক্লেশের কি কোন কারণ আছে? আমার মনে হয় ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যখন অদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, তখন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে অমি তখনই মানিব, যখন তিনি আমার মস্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হবেই।" শ্রীঅদ্বৈতের বয়ঃক্রম তখন ৭৬ বৎসর। তিনি বৈষ্ণবের রাজা, জগতে তাঁহার ঋষির ন্যায় মান্য। তাঁহার মাথায় পা দেন, এরূপ সাহসী তাঁহার গুরু শ্রীভগবান ভিন্ন অপর কেহ হন না। এই অদ্বৈতের মস্তকে ২৪ বৎসরের নিমাই, যদি তিনি মনুষ্য হন তবে পা দিবেন, ইহা হইতে পারে না। লোকের মনে বিশ্বাস যে, লঘুজন গুরুজনের মস্তকে পা দিলে তাহার সে পা খসিয়া পড়ে, কি তাহার কুষ্ঠ হয়। কিন্তু নিমাই অদ্বৈতের মস্তকে পা দিয়াছিলেন। আবার কোন হিন্দুসন্তান, যতই মন্দ হউক না কেন, জননীর মস্তকে পা দিতে পারে না। নিমাই পণ্ডিতের বয়ঃক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদার্পণ করিতে নিতান্ত যে পাষণ্ড, সেও পারে না। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ ভক্তিবৃত্তি তাহাতে তাঁহার মত বৃদ্ধা জননীর মস্তকে যে পদার্পন করিবেন তাহা একেবারে অসম্ভব।

সুতরাং নিমাই পণ্ডিত যখন জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সম্মুখে করযোড়ে কাঁপিতেছেন। শ্রীবাস বলিলেন, জননী। কর কি? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করিলেন, আর শ্রীভগবান তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ অর্পণ করিলেন। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইতেন তবে জননী প্রণাম করিলে, ভয় পাইয়া তিনি বলিতেন,—"মা! কর কি, উঠ, অকল্যাণ কেন কর?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান কি না। কিন্তু তখন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তখন তাহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তখন তিনি জগতের আদি, সকলের কর্তা, শচীরও পিতা। তাই তিনি অনায়াসে শচীর মাথায় পা দিলেন। যখন প্রভু ভয় না পাইয়া শচীর মাথায় পদার্পন করিলেন, তখন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই শ্রীভগবান। নিমাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান, এই লীলাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ। প্রভু জননীর মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তিনি শ্রীভগবান। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের কাচ করিতেন, তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনই জিহ্বা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িতেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহাই করিলেন, আর জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর ও জগতের পিতাও বটে।

যখন শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভগবান্-গৌরাঙ্গকে তরজার দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, এখন তিনি স্বধামে গমন করিতেন

পারেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ইষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রভু যখন শ্রীস্বরূপকে তরজার অর্থ শুনাইলেন, তখন তিনি বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে এ লীলাখেলা কি এতদিনে ফুরাইল! হায়! এতদিন পরে কি ন'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? স্বরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও তাহাই হয়। শ্রীঅদ্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভুকে এত শীঘ্র বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের কি ইচ্ছা করিয়া প্রভুকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? যাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্তই তিনি শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রেম-ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইবে, এখন ঠাকুর স্বধামে গমন করুন,—এই অদ্বৈতের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অন্যরূপ। যদিও শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। কেন? না, তখনও তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল॥ সেটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা শেষ হইলে প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলেও, প্রভু আরও দ্বাদশ বৎসর রহিলেন। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য রসস্বাদন দ্বারা জীবকে রসশিক্ষা দেওয়া। হৃদয়-কূপ হইতে রাধাকৃষ্ণ-লীলারস অবিশ্রান্ত উত্থিত করা যাইতে পারে। সামান্য কূপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে,

আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু শেষ দ্বাদশবর্ষ রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ-কূপ হইতে সুধা উঠাইতে লাগিলেন। ইহার এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য উদাহরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। অদ্বৈতের তরজার পর হইতে প্রভু ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব, গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক-বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্য সকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে রাধাভাবে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে, কি কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে করিতে, হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার তখন চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গম্ভীরা-লীলা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার রাধাভাব প্রায় সর্ব্বদা থাকিত, আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে স্বরূপের গলা ধরিয়া বলিতেতেছেন, "ললিতে, আমাকে কৃষ্ণের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" প্রভুর তখন আপনাকে রাধা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বোধ হইতেছে, আর সেইরূপ স্বরূপকেও ললিতা বলিয়া বোধ হইতেছে,—তাই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে হটাৎ চেতন হইল, তখন বিস্মিত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন,—স্বরূপ, আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলাম? আমার বোধ হইতেছিল যে আমি রাধা। কিন্তু আমিত রাধা নই, আমি কৃষ্ণচৈতন্য। ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন, আবার রাধা ভাবে "প্রলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল, চেতনা-ভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সেভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি, কখন কখনও রাধাভাব পাঁচদিন দশদিন

পর্য্যন্ত, ক্রমে মাসেক পর্য্যন্ত এবং শেষে বৎসরেক পর্য্যন্ত থাকিতে লাগিল। অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আসিতেন, কেবল তখনই চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় দিয়া আবার ভাবসাগরে ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকে পুনর্জ্জীবিত করা গৌরলীলার এক প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহার করিয়া মথুরায় গেলেন, তখন রাধা গোপীগণ সহিত কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বল হইলেন। এবং তখন রাধা এই বিরহে যে সমুদায় রস আস্বাদন করেন, প্রভু তাহাই করিতে ও জগতকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

পাঠকমহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক-ভক্তের তিনভাব,—যথা, পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাভাব বিরহ। আর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্ব্বরাগ ভাল। সেই প্রকার জীবেরও তিন ভাব,—আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ আর পূর্ব্বের আনন্দ স্মরণ। আনন্দের আশাকে বলে পূর্ব্বরাগ, আনন্দ ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্ব্বের আনন্দ স্মরণকে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা হটাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাঁহারা রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা, আমরা কি বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর শ্লোক শ্রবণ করুন—"সঙ্গম-বিরহঃ বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গম স্তস্যাঃ। সঙ্গমে সর্ব্বথৈকা বিরহে তন্ময় ভুলোকং।" অর্থাৎ যে পরিমানে বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে মিলনে আনন্দ। প্রভুর কি ভাব তাহা কতক শ্রীভাগবতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন যে, রাই-উন্মাদিনী বলিয়া একটি গীতের পালা সৃষ্টি হয়। জীব উহার অভিনয় দেখিয়া

আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্মাদিনী" প্রভুর পূর্ব্বে জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল, আর যাহা ছিল তাহা কথায়। কিন্তু 'রাই-উন্মাদিনী" কি, তাহা প্রভু নিজে আচরিয়া দেখাইলেন। তিনি কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও করিতে পারেন নাই। একটী পদের বিচার করিব। যথা—"রাই কৃষ্ণকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে নীরব হ'ল॥" প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে গেলেন, অমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠরোধ ও নিশ্বাস বন্ধ হইল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য কোথা ছিল? কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি আচরণ করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু নয়ন মুদিয়া; যেহেতু হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন। তাই পদস্খলন হইতেছে, আর ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, প্রভু নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন।" সেই হইতে রাই উন্মাদিনীর গীত হইল;—"অমন করে যা'স না, ধীরে চল। তুই নয়ন মুদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?"

প্রভুর কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে "জয়দেব," "বিদ্যাপতি," "চণ্ডীদাস" ও "বিল্বমঙ্গল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরূপ কথার দ্বারা প্রেমের সূক্ষ্ম-কণা লইয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দ্বারা উহা জীবের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই জীব এখন সেই "প্রেমের সূক্ষ্ম" তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক 'বনমালী—রাখাল।' তাহার নায়িকা সেইরূপ 'বনচারিণী—রাধা'। উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন ধার ধারেন না,—তাঁহারা প্রেমের পাগল। আবার ইহারাই শ্রীভগবান্, ঐশ্বর্য্য-বিবর্জ্জিত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের খেলা সুললিত কবিতায়

বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি মিষ্ট সুর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবকে এই সকল গীত আরও ভাল করিয়া শুনান হইত। দেবদাসীরা এই সকল গীত অভ্যাস করিত, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিত ও নৃত্য করিত। এই দেবদাসীরা দক্ষিণদেশের মন্দিরে প্রতিপালিত হইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে। আর দক্ষিণ-দেশের এক মন্দিরে যত মুরারী ছিল, প্রভু সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীদিগের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা যখন সুস্বরে ঠাকুরের নিকট গীত গাহিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে মোহিত করিত।

প্রভু বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন, জয়দেব কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুর্জ্জরী। তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন হঠাৎ প্রভুর এরূপ দ্রুতগতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রথমে প্রভুর দ্রুতগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন বুঝিলেন, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ যিনি গীত গাহিতেছেন, তিনি দেবদাসী—স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাসী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্বল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ, তাঁহাকে নিবারণ করিতে, তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। কারণ পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, সুতরাং যাইতে অনেক বাধা

পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে; কিন্তু তাহাতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যিনি গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাত্র অমনি প্রভুর বাহ্য হইল; তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন; বুঝিলেন যে, প্রভুকে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন, আর জগতের সমুদয় কার্য্যে কৃষ্ণলীলা অনুভব করেন। আবার রজনীতেও বটে এবং স্বপ্নেও তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্নে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শয্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন, প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আর তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যখন স্বপ্নে রসারসে নিমগ্ন হইলেন, তখন "কৃষ্ণ-বিয়োগিনী" ভাব গিয়াছে; বোধ হইতেছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তখন প্রভুর হৃদয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ-বেদন এত অধিক যে, তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু প্রভু তখন বৃন্দাবনে, আর সেইভাবে মন তাঁহার গরগর। প্রভু গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া

দর্শন করিতেন, এই তাঁহার নিয়ম; আর অগ্রবর্ত্তী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, সেই দিন ঠাকুরকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ করেন, সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু স্বপ্নাবেশে গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া, জগন্নাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন। এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়া দর্শন করিতেছে,—এক পা গরুড়ের উপর, আর এক পা মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভু বিহ্বল, অবশ্য তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট, গরুড় পক্ষীর ন্যায়, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা বিদেশীয় যাত্রীগণ জানিতেই পারিত না। স্বদেশীয় যাহারা, তাহারাও অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্য লোক দর্শন করিতেছে।

যখন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তখন প্রভু কতক বাহ্য পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, কর কি? উনি স্বচ্ছন্দে দর্শন করুন।" কিন্তু স্ত্রীলোকটি গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া, প্রভুকে দেখিবামাত্র, আস্তে আস্তে নামিলেন; নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি না জানিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি মরি, আর্ত্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য আমি যদি এই

প্রাপ্তি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগন্নাথে এ স্ত্রীলোকটির মন এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্কন্ধে যে পা দিয়াছে, তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে যাহাহউক, প্রভু এ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে, শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে যাইয়া, বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন। এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না;—দেখিতেছেন, জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা! তখন সন্তাপিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে, শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়া বামহস্তে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নখ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন-জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তখনকার মুখের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম, তবে জীবন সুখে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় প্রভুর সমস্ত দিবা গেল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ-বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ-বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনা-আপনিও ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ-বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় "উহুঃ মরি, উহুঃ মরি" বলিয়া সন্তাপ করে? বৃশ্চিক দংশনে মনুষ্যকে অস্থির করে, দষ্ট-ব্যক্তি জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; কিন্তু কে কোথা বিরহ-বেদনায় ধূলায় গড়াগড়ি দেয়? ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মূর্চ্ছিতও হয়। অবশ্য শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে,

—নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন; আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন, শুধু যে তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত দুঃখকর হয়। যদি শোকী ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে আবার পাইবে, তবে অমনি শান্তিলাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটী অদ্ভুত ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী মরিয়াছেন; আর তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া সে দেশের নিয়মানুসারে নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জনকয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত-দেহের নিকট আছেন; এক একজন করিয়া জাগিতেছেন, আর সকলে ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন যে, সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা দশজনেই সেই বালিকার পরকালের জন্ম দেখিলেন। যুবতীর জন্য তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়াছেন। তিনি দূরে অন্য স্থানে ছিলেন, কাজেই তাঁহার কন্যার আত্মাকে দেখিতে পান নাই; কিন্তু দর্শকগণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাসও করিলেন। তখন শোক ভুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা মরে নাই, জীবিত। তখন পুনর্মিলনের আশা হইল, তাই শোক গেল।

বিরহ-বেদনা পূর্ণরূপে উদয় হইলে "দশ-দশা" উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ তাঁহার রস-শাস্ত্রে "দশ-দশার" এই সমুদায় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; যথা—"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশঃ॥" অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২)

জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) কৃশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্য, (৬) প্রলাপ (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা (১০) প্রায় মৃত্যু, কি মৃত্যু ;—বিরহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়। জীবে ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর কৃষ্ণবিরহে এরূপ নয়টি দশা প্রত্যহই হইত, আর দশমী-দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রভু নয়টি দশায় অভিভূত হইয়া ছটফট করিতেছেন, শেষ-দশাটি অর্থাৎ মৃত্যু-দশাটি কেবল বাকী রহিয়াছে। স্বরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভুকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি ও পরিবর্দ্ধন হইল। মনে ভাবুন, বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা করিতেছেন। সে কিরূপ, না যেরূপ স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে লইয়া গম্ভীরা-লীলা করিতেন। তবে স্বরূপ রামরায় প্রকৃতই রাধাকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা করিতেন, বদন সেই দেখাদেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, কাহাকে রাধা সাজাইয়া, তাহাকে প্রভুর উক্ত কথা শিখাইয়া, কৃষ্ণযাত্রা করিতেন। প্রভু ঘনঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, প্রলাপ বকিতেছেন, কখন বা নিজেই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা-লাভ করিতেছেন, তখন স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি বল, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড়, দেখি যদি আমার শরীর শীতল হয়।" কখন বা স্বরূপকে বলিতেছেন, "একটি কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও, দেখি যদি প্রাণে বাঁচি।" রামরায় শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া, তাঁহার নিজকৃত একটি শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিলেন। আর স্বরূপ জয়দেবকৃত রাসের একটি পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল, হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ আসিল, এবং ক্রমে প্রভু দিশেহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় অনেক যত্ন

করিয়া, কতক-বা বল দ্বারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। তারপর প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, দ্বারে গোবিন্দ, কি স্বরূপ, কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোনদিন নিদ্রা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈস্বরে নাম জপিতে লাগিলেন।

প্রভু একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদায় কার্য্য অভ্যাসবসতঃ করিয়া সমুদ্র-স্নানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কখন একেবারে বিহ্বল অবস্থায় আপনার ভাবে আছেন; কখন-বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন। বলিতেছেন, "কে গা তুমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন বলিতে পার?" সে চুপ করিয়া থাকিলে, তখন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন?" কেহ-বা বলিল, "পারি আইস আমার সঙ্গে, আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া সে অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভুকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে তোমার কৃষ্ণ।" ঠাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাসুখী। যে দিবস প্রভু স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্কন্ধে আরূঢ় স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার কৃষ্ণকে হারাইয়া, সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিতেছিলেন, সেই রজনীতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অধিক রাত্রি দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে কতক বল দ্বারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু স্বরূপ নিজ কুটীরে না যাইয়া প্রভুর দ্বারে শয়ন করিলেন; কারণ দেখিলেন, প্রভু যদিও শুইলেন তবু ঘুমাইলেন না,—উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রভু ঘুমান

নাই বলিয়া স্বরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তরে যাইয়া দেখেন,—সর্ব্বনাশ! গৃহ শূন্য!! প্রভু নাই!!!

প্রভু কিরূপে কোথায় গেলেন? সদর দরজায় যেরূপ শিকলি দেওয়া ছিল সেইরূপই আছে। সেখানে আবার গোবিন্দ ও স্বরূপ শয়ন করিয়া। গৃহের মধ্যে তিন দিকে তিনটি দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া;—তবে প্রভু কিরূপে বাহির হইলেন? কিন্তু সে সামান্য কথা। প্রধান কথা, প্রভু কোথায় গেলেন?

তখন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে তল্লাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিয়া তল্লাস করিতে করিতে দেখিলেন যে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত পদ কটি ও গ্রীবার যত অস্থিসন্ধি আছে, সমুদায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রভুর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুর দেহ তখন আর মনুষ্যের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা ৫।৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেন পড়িতেছে। প্রভুর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তখন প্রভু "কাঁহা কাঁহা" শব্দ করিতে লাগিলেন, ও পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অস্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোড়া লাগিল। প্রভু উঠিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এদিক ওদিক

চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্বরূপের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি ?" স্বরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন সেখানে বলিব।" বাসায় আসিয়া স্বরূপ সমুদায় কথা বলিলেন। প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছুই মনে নাই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইলেন, আর আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎ যাইতেছিলাম।"

এই লীলাটি রঘুনাথ দাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন। তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে গিয়াছিলেন। যখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাঁহার মনে একটি কথা উদয় হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যখনই কোন অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত ভাব দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ যেমন প্রভু কান্দিতেছেন, তাহার পরেই নিশ্চিত তিনি হাসিবেন। এই প্রভুর শ্বাসরুদ্ধ হইল, পরক্ষণেই এরূপ জোরে নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য সম্মুখে উপবেশন করে। এই দেখা গেল প্রভুর অঙ্গ লৌহ-দণ্ডের ন্যায় শক্ত, আবার পরক্ষণেই উহা এত কোমল হইল, যেন উহাতে অস্থিমাত্র নাই। এই প্রভু এত ভারি হইলেন যে, তাঁহাকে ক্রোড়ে করে কাহার সাধ্য ; আবার তখনই এরূপ লঘু হইলেন যে, যে কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারে। এ সমুদায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, যখন প্রভুর অস্থিগ্রন্থি শিথিল হইয়া হস্ত পদ দীর্ঘ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপরীত ভাবও প্রকাশ পায়। আর একদিনের অদ্ভুত কাণ্ড শ্রবণ করুন। প্রভু, স্বরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে নিশিযাপন করিতেছেন। কখন স্বরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। নিশি দুই প্রহর হইলে, তাঁহারা প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া, শয়ন করাইয়া, গৃহে গেলেন। কেবল

গোবিন্দ দ্বারে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া উচ্চৈস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন। তখন গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন পূর্ব্বকার একদিনের ন্যায় তিন দ্বারে কপাট, কিন্তু প্রভু ঘরে নাই। তখন তিনি দৌড়িয়া গিয়া স্বরূপকে সংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ দৌড়িয়া আসিলেন, আর প্রদীপ জালিয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। গতবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে পাওয়া গিয়াছিল, তাই প্রথমে সেখানে গেলেন। কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না; পরে দেখেন যে, সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রভুকে পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রভু তিনটি অত্যুন্নত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন। রঘুনাথ দাস এবারও তল্লাসকারীর মধ্যে ছিলেন। তিনি তাঁহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন যথা—

"অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, আর তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছে। তাহারা যেন অতি যত্নের সহিত প্রভুর অঙ্গ রক্ষা করিতেছে, প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। ভক্তগণ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন? না—

"পেটের ভিতরে হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে পড়িয়া অন্তরে আনন্দে বিহ্বল॥

পূর্ব্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা চরিতামৃতে এইরূপ আছে,—

"প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে তাতে মাত্র॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥"

এখন উপরের লিখিত দেহের দুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উহা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুস্পার্শে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না!

"গাভী সব চৌদিকে শুঁয়ে প্রভুর অঙ্গ।
দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভুকে, চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভুকে সেই অবস্থায় গৃহে লইয়া আসিলেন। সকলে চিন্তিত, মনের ভাব এইবার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন বহুক্ষণ পরে প্রভু কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া "হরি বোল" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পরে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগত গ্রন্থে 'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে কত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। যোগসাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে তাহা সমুদয়

লাভ হয়, অধিকন্তু ভগবানকেও পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চাকেই বলে 'ভক্তিযোগ'। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্ত্তন।

প্রভু চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহাকে দেখিতে চাহেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, অতি দুঃখে ও ক্লেশে স্বরূপকে বলিতেছে, "তোমরা আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া এখানে আনিলে কেন?" স্বরূপ বলিলেন; "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বৃন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার পরে বেণুসঙ্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃত-নিকুঞ্জে আগমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কৃষ্ণের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। সে মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। গোপী, রাধা, কৃষ্ণ সকলে হাস্যপরিহাস নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। আমি সুখে এই সমুদায় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিলে। এ কাজ কি ভাল করিলে?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে প্রভুর অনেক বাহ্য হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না; বলিলেন, "স্বরূপ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও জুড়াও; আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে।" স্বরূপ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি,—

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতং সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

অর্থাৎ "হে অঙ্গ! (শ্রীকৃষ্ণ!) আপনার কলপদ অমৃতায়মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ স্ত্রী নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পক্ষী বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলক সমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবার প্রভু শ্লোক-বর্ণিত রসে নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলি। কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আসিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, তাহার ভাব "কাস্ত্র্যঙ্গ-তে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইয়া কৃষ্ণের সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়া উহা প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন, আর স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া, বলিতেছেন (যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে) "হে কৃষ্ণ! এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা খুটিনাটি জানি না। গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ সাধ্য কাহারও নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল; করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের, স্ত্রীলোকের লজ্জা, কুলের ভয়, সংসারের মমতা, সমুদয়ই অস্ত্রের ন্যায় ছিল; কিন্তু তোমার

বেণুগীতে সমুদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথে ভিখারী হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম্ম করিও না!' একথা কি উচিৎ?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আসিল; আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, আর বাড়ী গেলেই-বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো। হে প্রাণ! হে প্রাণের প্রাণ! আমরা উপায়হীন অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না" প্রভু গোপী-ভাবে এইরূপে কৃষ্ণকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য হইল। তখন স্বরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণচৈতন্য! আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম? আমার বোধ হইতেছে যেন আমি সেই গোপী, যিনি রাসের রজনীতে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্যায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলাম। একি প্রলাপ করিলাম?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন।

এইরূপে প্রভু যখন তাঁহার কৃষ্ণচৈতন্যত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণের চর্চ্চা করিতেন, তাহাকে 'প্রলাপ' বলে। যেহেতু তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুনুন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন পূর্ব্বে কৃষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন, তাহা ছাড়িয়া স্বরূপ রামরায়কে সখী বোধ করিয়া, তাহাদিগকে, মন উঘাড়িয়া মনের দুঃখ বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সখীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তখন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সখীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন "সখি! দেখ কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের বাহির হই, সে কি সাধে? কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত হইতেও মধু, কৃষ্ণের কণ্ঠের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, কৃষ্ণের গীতে শ্রোতা মূর্চ্ছিত হয়, আবার বেণুগানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্যা করিতেছেন। যে কর্ণ কৃষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধীর।

প্রভু যত বলিতেছেন, ততই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে কর্ণ বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, কৃষ্ণ ত সেখানে নাই! তখন বিরহিণী ভাবে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন,—

> "কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
> কথয়তঃ-কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
> মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
> কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥" অঙ্ক ১৭,৫১

শ্লোকের বিচার দুই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত-কবিগণ রাধার উক্তি একটি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরূপ। আর একরূপ প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেছেন। প্রভু রাধা হইয়া কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন ;—

"সখি! উপায় বল কি করি, কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই? এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছ। আবার, আমার দুঃখ তোমাদের ছাড়া আর কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। সখি, কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্ত কথা বল।"

বিল্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। সেই শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত-কবি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন" ইত্যাদি। আর আপনি রাধা, সুতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "সখি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর" ইত্যাদি। এখন বিল্বমঙ্গলের "কিমিহ কৃণুমঃ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভু রাধা হইয়া কিরূপ করিলেন তাহার আভাস বলিতেছি।

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর স্বরূপ রামরায় কাজেই তাঁহার সখী। কৃষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ই খেলা করিতেছে। যখন আশা আসিতেছে তখন সখীগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, যথা—

"তোমার আমার প্রিয়সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান মন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধ বাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি? কোথা যাব, কি করিব কারে মনের ব্যথা বলিব, কিরূপে কৃষ্ণ পাব, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর একটি পদ শ্রবণ করুণ। শ্রীমতী সখীগণ লইয়া বসিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী আপনি সখীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন। কৃষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু আছে সমুদায় তাঁহাকে দিয়াছি, তবু তাঁহার কৃপা পাইলাম না। অতএব নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই ভাল।"

হে কৃপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গীত শ্রবণ করিয়াছেন? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর কৃষ্ণের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণনাম আর করিব না।"

সখী। কৃষ্ণ ভজিবে না, তবে কাহাকে ভজিবে?

রাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ভোলা দয়াময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল চঞ্চল নিষ্ঠুর; তাঁহাকে কি আমাদের স্থায় অবলার সম্ভব হয়? কৃষ্ণ ভজিব না, যাহাতে কৃষ্ণনাম স্মরণ করায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

সখী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা? কেশে যে কৃষ্ণনাম স্মরণ করায়?

রাধা। কেশ মুণ্ডন করিব।

সখী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্যামা সখীর কি করিবা?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণযাত্রায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপে রাধা ও সখীতে কথাবার্ত্তা

দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল ? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহান্তগণ পাইলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিলেন যে, 'কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে, তাঁহাকে আর ভজিব না।" প্রভু ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে জানিবার জন্ত প্রভু নয়ন মুদিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহারনিমিত্ত সুন্দ-বদনে মধুর হাস্তের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন।

প্রভু ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "কি সর্ব্বনাশ! কৃষ্ণকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছন্দে আছেন। তাঁহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব ? হইল না, হইল না! প্রভু একটু চুপ করিলেন, গদগদ হইয়া বলিতেছেন "সখি! আবার ও কি হইল ? আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আরো কান্দিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখনই না, কখনই না। আমি যে বলিয়াছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব, সে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, ক্ষুব্ধ হইয়া। তাহাও নয় তোমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি ? তাহা কি কখন হয় ? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর ? তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার রহিবে কি ? তোমা ছাড়া আমার আর কে আছে, বা কি আছে ? তুমি না আমার নয়নরঞ্জন, তুমি না

আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। অতি অল্পক্ষণ পরে সম্বিত পাইলেন; তখন দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। ইহা দেখিয়া আবার সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "কৈ, কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিলেন! হা পদ্মপলাশলোচন! হা শ্যামসুন্দর! হা অলকাবৃত! আমাকে ছাড়িও না। কোথায় তুমি? কোথায় গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি এলাম! ইহা বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কিন্তু পরিলেন না ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেলেন।

এই গেল প্রলাপের পর দিব্যোন্মাদ,—অগ্রে প্রলাপ, পরে দিব্যোন্মাদ। রাধাভাবে যে সমুদায় কথা কহিলেন সে "প্রলাপ;" আর রাধাভাবে যে কার্য্য করিলেন সে "দিব্যোন্মাদ।" যখন রাধাভাবে মনের ভাব হৃদয় উখাড়িয়া বলিতেছিলেন, তখন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। আবার যখন কৃষ্ণের অন্বেষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন,—সে প্রভুর "দিব্যোন্মাদ"। প্রভু চেতন পাইয়া কৃষ্ণকে ধরিতে যেই দৌড়িলেন অমনি স্বরূপ উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, এবং কতক বলপ্রকাশ করিয়া, কতক নানারূপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল। তখন প্রভু বিষণ্ণ মনে বলিতেছেন, "স্বরূপ, মধুর গীত গাহিয়া আমার শরীর শীতল কর।" তখন স্বরূপ গাইলেন—"হামার আঙ্গিনা আওব যবে রসিয়া। পালটি চাহব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥"

প্রভুর হৃদয়ে সেই ভাব তৎক্ষণাৎ স্পর্শিল, আর তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া ভক্তগণকে অনেক সময় তত্ত্ব

দিতেন। প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতি দূরে চটক পর্ব্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রভুর বোধ হইল যে, সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত! প্রভু কেবল এক পর্ব্বত জানেন,—তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন। তখন গোবর্দ্ধনের স্তুতিজনক শ্রীভগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিয়া সেই চটক পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। দৌড়িলেন কিরূপে, না বিদ্যুৎ গতিতে। গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভুর সমুদ্রস্নানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ-ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নানের স্নানে ছুটিলেন। এইরূপে স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিত্যাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্য্যন্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ, দৈব তাঁহাদের সহায় হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের তাঁহাকে পাওয়া দুর্ঘট হইত। যে বায়ুগতিতে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিবার সাধ্য হইত না। কিন্তু প্রভু এইরূপে যাইতে যাইতে স্তম্ভভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল। তখন চলিতে পারিলেন না, এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটী পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতেছে। বর্ণ হইয়াছে শঙ্খের ন্যায়, যেন শরীরে শোণিত-মাত্র নাই। কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে, আর নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময় প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং করঙ্গে জল পূরিয়া প্রভুর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া, বহির্ব্বাস দ্বারা বায়ুবীজন

করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভুর চেতন হইল, তিনি "হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন; আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন। যাহা দেখিতে চান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, যেয়ে দেখি কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন। বেণু শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব। কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গেলেন, তখন সখীগণ কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া আসিলে, আর আমাকে বলদ্বারা ধরিয়া আনিলে। কেন দুঃখ দিতে আনিলে? সুখে কৃষ্ণলীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।" ইহা বলিয়া মহাদুঃখে প্রভু আবার রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় পুরী ও ভারতী আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্য পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট বাহ্যলাভ করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা এতদুর কেন আসিয়াছেন?" তখন সকলের মনে আনন্দ হইয়াছে, তাই পুরী সহাস্যে বলিলেন, "এতদুর আসিলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তখন লজ্জা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন।

ব্রজলীলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক লীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা লক্ষবার পাঠ করিলেও জীবের

তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরমসুন্দর, প্রেমপাগল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন কি, না,—প্রেমের হাট; সেখানে প্রীতি বিকিকিনি হয়। আপনি "মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।" অর্থাৎ রাসের হাটে গোপীগণ তাঁহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন, আর মদনমোহন কৃষ্ণ তাহা ক্রয় করিতেছেন।

শরৎপূর্ণিমা রাত্রি, বন কুসুমে সুশোভিত; কুসুমের সুগন্ধে অটবী আমোদিত। কৃষ্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কলস্বরে বেণুবাদন করিতেছেন। বাঁশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন।

"মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন ঐ বাজে তান তরঙ্গ!
ঐ শুন শ্যামের বাঁশী বাজে বাজে ওই।
শ্যামের বাঁশী বাজে—কোথা প্যারী।
আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি॥
শ্যামের বাঁশী বাজে—এসো রাই!
(তোমা বিনা) আমার বৃন্দাবনে শোভা নাই॥

গোপীগণের কর্ণে সেই মন্দ মন্দ তান প্রবেশ করিল। তখন তাঁহারা উন্মাদিনী হইয়া, কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। যাঁহারা সন্তানকে স্তন পান করাইতে ছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাঁহারা দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন তাঁহারা সেই কটাহ নামাইয়া, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন। তাঁহাদের অভিভাবকেরা শাসন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তাহাতে এই ফল হইল যে, তাঁহাদের চিত্ত তদ্দণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে উপস্থিত হইল। কেহ বা ভাবিলেন, কৃষ্ণের নিকট সুবেশ করিয়া

যাইবেন কিন্তু বিহ্বল অবস্থায় কর্ণের ভূষণ হস্তে ; হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিয়া চলিলেন। যথা পদ—

"আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। ধ্রু।
বাঁশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা।
সুখে চলে, পড়ে ঢলে, না জানে আপনা।
গোপনারী, সারি সারি, (চলে) শ্যাম দরশনে॥"

তাঁহারা উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল, আমি ভয় দূর করিব। কিম্বা বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে? বেশ, দেখ স্বচ্ছন্দে, আমার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদন কর।

ফল কথা, জীব দুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। হয় ভয় পাইয়া, না হয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে জীব ও ভগবানে এরূপ সাক্ষাৎ, সেখানে উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ-সাধন। জীব বলে 'আমাকে বর দাও' আর শ্রীভগবান বর দিলেন। কিন্তু গোপীদের নিস্বার্থ ভালবাসা তাঁহারা বর চাহিলেন না ; তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম ; আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।" তখন তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তোমরা পতি ত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করিবে? এত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয়? ইহাতে তোমাদের সর্ব্ব মতে স্বার্থের হানি হইবে। তোমাদের দিবার মত কোন সম্পত্তি আমার নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে আছে মাত্র বেণু। অতএব যাহার কাছে বর পাইবার (অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির) আশা থাকে সেখানে যাও। তাই বলি সর্ব্বজন-অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।" এই সর্ব্বজন-অবলম্বিত পথ কি? না,—সংসার-ধর্ম্ম,

পূজা-অর্চ্চনা, জীবে দয়া, পুষ্করিণী খনন, মন্দির স্থাপন ইত্যাদি করা। আর যদি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে চাও, তবে বনে যাও, চিত্ত-সংযম যোগ, তপস্যা ইত্যাদি কর, করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ কর। কিন্তু গোপীগণ ইহার কিছুই করিলেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ একরূপ উদাসীন। তাঁহাদের দান, ধর্ম্ম, পূজা, অর্চ্চনা, তপস্যা, যোগসিদ্ধি,—এ সমস্ত কিছুই নাই; অথচ সংসারী হইয়াও কোন কার্য্য করেন না। তবে কি করেন? না,—কৃষ্ণের বেণুগান শুনিয়া ও তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে নূতন পথ অবলম্বন করিতেছে, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, হয়ত নরকে যাইবে;" তখন তাঁহারা কৃষ্ণের নিমিত্ত নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু পথ নয়। বড়লোকে বলেন, "সোহহং"—অর্থাৎ তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি "আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করি," "আমার ভাল-মন্দ অপর কেহ করিতে পারে না।" যাহারা কৃষ্ণের রূপ আস্বাদ করিয়া আনন্দাশ্রু পাত করেন, তাঁহারা সাধারণের মতে উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় মন্ত্রৌষধি দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বনে গমন করিয়া, চিত্ত সংযম করিয়া, বর প্রার্থনা করিয়া, শ্রীভগবানকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তপস্যা করেন। এই সমুদায় হইতেছে—সর্ব্ববাদিসম্মত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ কি করিতেছিলেন,—না, স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি-ভজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, "আমার জন্য তোমরা কি এই সাধু-পথ ত্যাগ করিয়া, কুলের অবলা হইয়া, সমাজের বিড়ম্বনা সহ্য করিবে?" তাহাতে গোপীগণ অম্লান-বদনে বলিলেন, "তথাস্তু", অর্থাৎ তাহাই হইবেক। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে

গোপীগণ দ্বারা দেখাইলেন যে তাঁহারা প্রেমের উপাসক। আর কি দেখাইলেন তাহাও বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। শ্রীভগবান কীটাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর একটি গুণ আছে। তিনি যে শুধু সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা নহেন, তিনি মাধুর্য্যময়,—শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখিলেন। জগতের সকলে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, কেবল বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যের উপাসক।

শ্রীভাগবত-গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রধান অশীর্ব্বাদ। শ্রীমহাপ্রভু সেই কৃষ্ণপ্রেম কি, তাহা দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। কিরূপ পবিত্র মধুর ধর্ম্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, "কৃষ্ণ! আমি তোমার, তুমি আমার।" "আমার এক কৃষ্ণ আছেন আর কৃষ্ণের এক আমি আছি।" রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বর্ণিত আছে। "হে কৃষ্ণ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে চাও না। তোমায়-আমায় চিরদিন প্রেমানন্দে কাটাইব।" "আমি তোমার, তুমি আমার"—এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে শিক্ষা দিলেন; কিরূপে বলিতেছি—

যখন গোপীগণ সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন, তখন তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের মনে দম্ভ হইল। যেই মাত্র গোপী হৃদয়ে দম্ভের সৃষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ লতা মৃগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন; যতই পড়িবেন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন কৃষ্ণ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন—

প্রভু সমুদ্র যাইতে পুষ্পোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বৃন্দাবন ও রাসের রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্ব্বদা কৃষ্ণবিরহে অভিভূত; তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে, স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভু সেই কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। প্রভু কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, "হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্কন্দে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম শ্লোকে দেখ) হে কোবিদার, হে অর্জ্জুন, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে অন্যান্য তরুগণ! তোমরাও এই যমুনাকূলে থাক, অতএব তোমরা দুঃখী-জন প্রতি দয়ালু। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন?"

হে পাঠক, একদিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষগণকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্য কোন জীব পারে না। গোপী-ভাব না পাইলে, বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা না হইলে, নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে, প্রকৃতপক্ষে জীব এইরূপ বলিতে পারে না।

ভাগবতে গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, প্রভু কার্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, "কৃষ্ণ

অবশ্য এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিলেন ; বোধ হয় আশীর্ব্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মস্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে।” প্রভুর মনের ভাব অবশ্য এই যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, তাহারা সকলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাতেই রত ! প্রভুর যখন ভাবগত-বর্ণিত কৃষ্ণান্বেষণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তখন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল ; আর দেখিলেন যে, যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকাবৃত-মুখে বেণু-বাদন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিলেন, আর তদ্দণ্ডে ঘোরমূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত, নয়নে আনন্দাশ্রুর স্রোত চলিতেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া তাঁহার চেতন করাইলেন। তখন প্রভু এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন ; শেষে বলিতেছেন, “কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন ? কৃষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া পাগল করিয়া আবার ফেলিয়া গিয়াছেন ! স্বরূপ ! বল আমি এখন কি করি ? তখন স্বরূপ গাইলেন—

“রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥”

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু “গাও” “গাও” বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে বিরাম নাই, স্বরূপকেও থামিতে দিতেছেন না। পরে যখন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তখন স্বরূপ চুপ করিলেন,—প্রভু বলিলেও গাইলেন না ; কাজেই প্রভু থামিলেন। তখন ভক্তগণ প্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন। কিন্তু

ভক্তের যে অধিকার, তাহা প্রচুর কিনা, জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, ভক্তের যে সম্পত্তি তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য, তাহা প্রভু জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে ; তবে তিনি দেখিয়া চমকৃত হইলেন যে, শ্রীভগবানের যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। যথা, চরিতামৃতে—

'ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত অন্য কেবা আর॥"

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা কত মধুর, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। দেখিলেন যে,—কৃষ্ণ হইতে রাধা যে সুখ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে পরমানন্দময় তিনিও তত সুখ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভু দুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ; —আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেখানে সম্ভাবনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রভু এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার অধরামৃতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর-দর্শন করিতেছেন। হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল, আর দ্বার বন্ধ হইল। ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে তাহার কিছু সেবা করাইলেন। ইহা আস্বাদ করিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সুকৃতি লভ্য ফেলালব।"

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার অর্থ কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "ফেলা মানে কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ। ইহা পরম-ভাগ্যে মিলে, আর এই

যে তোমার আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।

সেই প্রসাদ ঠাকুর নিজে কিছু আস্বাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের দ্বারা বাড়ী আনিলেন। তবে সে যে কৃষ্ণের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদের অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আস্বাদ। প্রভু ইহা আস্বাদ করিলেন, আর আনন্দে তাঁহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিছু কিছু বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলেই দেখিলেন, জগতে সেরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গন্ধ ও আস্বাদ এ জগতের নয়।

প্রিয়-বস্তুর অধর-রস অতি মধুর। শ্রীভগবান প্রিয় হইতেও প্রিয়, সুতরাং তাঁহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে। সুগন্ধ আমাদের নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন্ কোন দ্রব্য জিহ্বায় দিলে কেন সুখের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিন্তু "তিনি জানেন। তাই যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চর্ব্বিত তাম্বুল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই যখন প্রভুর ইচ্ছা হইল যে, একদিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধর-রসের মাধুরী দেখাইবেন, তখন গোপালভোগ প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কোন কোন মাধুরী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সমুদায় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের জলকেলি লীলা।

শরৎকাল, শুক্লপক্ষ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর। প্রভু-রাসের এক একটি শ্লোক পড়িতেছেন, আর

তাহা কি, কার্য্য দ্বারা দেখাইতেছেন! এইমাত্র একদিনকার লীলা বলিলাম। তখন প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন জ্যোৎস্নায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তখন প্রভু রাসের জলকেলির শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া; জলকেলি কি, তাহা আস্বাদিতে, কি জীবগণকে শিখাইতে সমুদ্রে ঝম্প দিলেন। প্রভু এরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্রদিকে গমন করিলেন যে, ভক্তগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই ছিলেন, আর নাই। সকলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাচ্ছিল্যের সহিত, পরে মনোযোগের ও আশঙ্কার সহিত তল্লাস করিলেন। কোথা গেলেন। চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন, যখন রজনী তৃতীয়প্রহর তখনও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই; কাজেই সকলে চিন্তায় মৃতবৎ।

আমার স্বরূপের প্রাণ অবশ্য ওষ্ঠাগত হইয়াছে। হটাৎ দেখেন, একজন ধীবর গীত গাইতে গাইতে আসিতেছে। আর দেখেন যে, সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিলেন, এ প্রভুর কার্য্য। স্বরূপ বলিতেছেন, "ধীবর, তোমাকে এরূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি?" ধীবর বলিল, "এতদিন এখানে মৎস্য-শিকার করিতেছি, কিন্তু কখনও ভূত দেখি নাই। অদ্য জালে একটি মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে দেহ ছাড়াইতে উহা স্পর্শ করিতে হইল। স্পর্শমাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর বদনে কৃষ্ণনাম আসিল। এই দেখ আমার বদন কৃষ্ণনাম আর ছাড়ে না।"

ধন্য আমার প্রভু! তখন স্বরূপ সমুদায় বুঝিলেন, এবং জেলের সঙ্গে যাইয়া দেখেন যে, প্রভুর সেই লক্ষ্মীর সেবিত-দেহ, সমুদ্রতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন; তাহাতে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। তখন তাঁহার কর্ণে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কর্ণে কাড়িকে

করিতে, অনেক পরে প্রভুর চেতন হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা আসিল। তখন তিনি কৃষ্ণের জলকেলি বর্ণনা করিতেছেন; বলিতেছেন, "কৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনার স্বচ্ছজলে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল, আর শ্রীকৃষ্ণের মুখও পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের বদন লাল, আর শ্রীকৃষ্ণের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপদ্ম ও নীলপদ্ম যমুনায় ভাসিতে লাগিল; আর এই নীলপদ্ম লালপদ্মকে ও লালপদ্ম নীলপদ্মকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লাল পদ্মে মিলন হইল।

বৃন্দাবন-মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি "শ্রীকালাচাঁদ গীতায় উহার কিছু আভাষ দিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন।

৫ম খণ্ড সমাপ্ত।